পবিত্র ক্রুশের
বিজয়োৎসব পর্ব

প্রকাশনার ৮০ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩৩ ♦ ১৩ - ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

ক্রুশের মাহাত্ম্য

খ্রিস্টীয় পরিবারে কথা বলা ও শোনার গুরুত্ব

শত যুগ ধরে

শ্যামল গ্যাসপার

মরিতে চাহি না আমি
চাই বেঁচে থাকতে
যুগ-যুগ শত যুগ ধরে
তোমাদের হৃদয়ের মাঝে
এক কোনে, যেখানে
ভালবাসা আছে।
যখন উচ্চারিত হবে শত কণ্ঠে
আমার কবিতা কোন
সাহিত্য সভায়,
বেঁচে থাকবো আমি
আমার কবিতায়।
স্মৃতির পাতা উল্টালে
সেখানে খুঁজে পাবে আমায়।

বিজ্ঞ/১৪৯/২০

প্রয়াত ইউজিন শ্যামল গমেজ (গ্যাসপার)
জন্ম: ২৭ অক্টোবর ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

তিনি ছিলেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, সমাজ সেবক, দেশপ্রেমিক, শিক্ষানুরাগী, নাট্যকার, লেখক, ধর্মানুরাগী ও ভালবাসার মানুষ। দেখতে দেখতে দুটি বছর পেরিয়ে গেল, আজও মনে হয় তুমি আছো আমাদের মাঝে। তোমার কবিতার মধ্যে তোমাকে খুঁজে পাই, তোমার পরিবারের মাঝে। তাই বিশ্বাস করি তুমি ছিলে, তুমি আছ, তুমি থাকবে। তুমি স্বর্গ থেকে তোমার পরিবারকে আশীর্বাদ কর, তারা যেন তোমার মত আদর্শ প্রার্থনাপূর্ণ উদার মনের মানুষ হতে পারে। পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমাকে অনন্ত শান্তি দান করেন।

প্রয়াত ইউজিন শ্যামল গমেজ এর শোকার্ত পরিবার

স্ত্রী : পূর্ণিমা গমেজ
ছেলে : অভিষেক গমেজ, ছেলে বউ : চৈতি গমেজ
মেয়ে : সেবা ডি' ক্রুজ, মেয়ে জামাই : জুয়েল ডি' ক্রুজ
নাতি : অর্ক ডি' ক্রুজ ও ঋত্তিক গমেজ
নাতিন : অর্পা ডি' ক্রুজ ও রোজ গমেজ
দিদি : সিস্টার পলিন গমেজ, (সিএসসি)

স্বর্গ যাত্রার ষষ্ঠ বছর

বাবা! বাবা! বাবা! বাবা! বাবা! বাবা! বাবা! বাবা! বাবা! বাবা!

বাবা নামের এই শব্দটা এখন খুব কম সময়ই উচ্চারণ করা হয়। কিন্তু তার মানে এই না যে, তোমার কথা মনে পড়ে না বাবা। সব সময়ই তোমার কথা মনে পড়ে। বাবা বলে ডাকলে কোন প্রতিউত্তর এখন আর আসে না। কিন্তু হতাশা, বিষন্নতা আর দুঃখ আসতে একটুও সময় নেয় না। তোমার সাথে ভালো-মন্দ কাটানো সময় এখন শুধুই স্মৃতি। একটা সময় ছিল প্রতিদিন তোমার ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকতাম, এখনো থাকি, কিন্তু তুমি আর ফিরে আসো না। এখন তোমার কথা ভুলে যাবার একমাত্র ভরসা চোখের পানি। কতদিন হয়ে গেল তুমি আমাদের কাছে এসো না! ভালো কোন কাজ করলে, মার কাছে গর্ব করে এখন আর কেউ বলে না "আমার মেয়েরা"।

বাবা, জানি আমাদের অনুরোধটা তুমি রাখতে পারবে না, তবুও বলি "বাবা আমাদের কাছে ফিরে এসো। এখনো আমরা তোমার অপেক্ষায় থাকি।"

প্রয়াত স্বপন আলেকজান্ডার কস্তা
জন্ম : ২৭ জুলাই, ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

তোমার স্নেহধন্য,
স্ত্রী : স্মৃতি গমেজ
বড় মেয়ে : সিলভিয়া কস্তা, মেয়ের জামাই : পলক রোজারিও
ছোট মেয়ে : সিনথিয়া কস্তা

বিজ্ঞ/১৪৮/২০

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮০, সংখ্যা : ৩৩
১৩ - ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
২৯ ভাদ্র - ৪ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

ক্রুশ ও করোনাভাইরাস

বিশ্বের সকল খ্রিস্টানদের কাছে ক্রুশ একটি প্রিয় ও তাৎপর্যপূর্ণ প্রতীক। খ্রিস্টবিশ্বাসী ভাই-বোনদের সাথে অন্যধর্মের ভাইবোনেরাও বিশ্বাস করেন ক্রুশই খ্রিস্টানদের পরিচয়। ক্রুশের চিহ্ন দিয়ে দিন শুরু এবং তা দিয়ে দিন শেষ করেন অনেক ভক্তপ্রাণ খ্রিস্টবিশ্বাসী। ক্রুশকে আপন করে নিয়েই অনেক খ্রিস্টবিশ্বাসী নিজের বাড়ি-ঘরের দৃশ্যমান স্থানে ক্রুশ প্রতিকৃতি রাখেন। তাই বর্তমান সময়ে ক্রুশ খ্রিস্টানদের কাছে গর্ব ও আত্মপরিচয়ের একটি মানদণ্ড। ক্রুশের প্রতি আস্থা, ভালবাসা ও সম্মান জানিয়েই প্রতিবছর ১৪ সেপ্টেম্বর পালন করা হয় পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব। স্মরণ করা হয় মানবজাতির মুক্তি আনয়ন করতে এই ক্রুশেতে মৃত্যুবরণ করেন প্রভু যিশু খ্রিস্ট। ক্রুশমৃত্যু অতীব কষ্টকর জেনেও পিতার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে যিশু তা গ্রহণ করেন ও পরিত্রাণের পথ খুলে দেন।

যিশুর সময়কালে সুশিক্ষিত গ্রীকদের কাছে ক্রুশ মৃত্যু ছিল মূর্খতার প্রতীক আর ইহুদীদের কাছে ঘৃণা ও রোমীয়দের কাছে লজ্জার প্রতীক। যিশু তা ভালোভাবেই জানতেন। যিশু ইহুদী হওয়াতে তাঁর ক্রুশ গ্রহণটা ছিল ভীষণ লজ্জার ও অপমানের। কিন্তু মানুষের পরিত্রাণের জন্য সবচেয়ে ঘৃণ্য দণ্ড নিতেও দ্বিধা করেননি যিশু। অন্যায়ভাবে যিশুর কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া ভারি ক্রুশ বহন করেছেন কালভেরি পর্বত পর্যন্ত। যাত্রাপথে ক্রুশ বহন করতে তাঁর অনেক কষ্ট হয়েছে। তিনি বার-বার মাটিতে লুটয়ে পড়েছেন, সৈন্য ও বিদ্রূপকারীদের তিরস্কার শুনেছেন। তবুও ক্রুশ নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। ভীষণ কষ্টকর হলেও তিনি ক্রুশীয় মৃত্যু থেকে নিজেকে সরিয়ে নেননি। আর তাইতো যিশুর মধ্যদিয়ে ক্রুশ হয়েছে মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত। ক্রুশে মৃত্যুবরণ করার মধ্যদিয়েই যিশু স্বর্গে যাবার পথ উন্মুক্ত করেন। আর তাইতো যিশু সকলকে উদাত্ত আহ্বান করেন, যেন আমরা সকলে প্রতিদিনকার ক্রুশ বহন করে তাঁকে অনুসরণ করি। ক্রুশ বহনের কষ্টের মধ্যদিয়েই আমরা বিজয়ের আনন্দ পেতে পারবো।

বর্তমানে খ্রিস্টানদের কাছে ক্রুশ গৌরব ও আনন্দের কারণ হলেও ক্রুশের মূল শিক্ষা হলো আত্মদান ও ভালোবাসা। ঈশ্বর ও মানুষকে ভালোবাসার কারণে নিজেকে দান করবো। নিজেকে দান করা এতো সহজ নয়। নিজের আরাম-আয়েশ, সম্মান, ভোগ-বিলাসিতা, আমিত্ব, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অহংকার, ঈর্ষা, রাগ ইত্যাদি ত্যাগ করতে প্রতিনিয়ত নিজের কাছে নিজেই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হই। এগুলোই আমাদের প্রতিদিনের ক্রুশ। যিশু আমাদেরকে আহ্বান করছেন এই ক্রুশগুলো বহন করতে। তাই ক্রুশ কষ্ট আনে এটিই স্বাভাবিক ও সর্বজনীন একটি বোধ। কষ্টকর হলেও অপরের মঙ্গলের জন্য যখন আমরা নিজেদের ক্রুশগুলোকে বহন করি তখন যিশুর সাথে একাত্ম হই। যিশু আমাদেরকে প্রতিদিনকার নিজের ক্রুশ বহন করার আহ্বান জানিয়ে প্রতিদিন বিজয়ী হতে বলেন।

বর্তমান সময়ে করোনাভাইরাসের আক্রমণ বৈশ্বিক একটি ক্রুশময় অবস্থা। বৈশ্বিক এই ক্রুশকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে এবং বহন করে নিয়ে এগিয়ে চলতে হবে। করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি ক্রুশের তীব্র যন্ত্রণা তার শরীরে অনুভব করে আর আক্রান্ত ব্যক্তির পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনও আর্থিক ও সামাজিক সঙ্কটে ক্রুশের যন্ত্রণা তিলে-তিলে অনুভব করেন। করোনার এই ক্রুশময় যন্ত্রণা মোকাবেলা করতে আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে সকলে যদি নিজেদের ক্রুশগুলোকে বহন করি তাহলে সরকারের বৃহৎ ক্রুশের বোঝাটির ওজন হ্রাস পাবে। আমাদের মানবকূলকে চিন্তা করতে হবে, প্রকৃতিকে যন্ত্রণা দিয়ে ক্রুশবিদ্ধ করে আমরা কি করোনাভাইরাসকে আমাদের জীবনকে ক্রুশবিদ্ধ করতে ডেকে এনেছি! করোনাকে ক্রুশবিদ্ধ করে বিজয়ী হতে হলে আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে প্রকৃতি ও প্রতিবেশির প্রয়োজনের প্রতি। শুধুমাত্র নিজেকে নিয়ে নিমগ্ন না থেকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কাজ করতে হবে। বিগত কয়েকদিনে করোনায় আক্রান্ত হবার আনুপাতিক হার কিছুটা কমেছে। পবিত্র ক্রুশের কাছে মৃত্যুর যেমন পরাজয় হয়েছিল, আমাদের সকলের সচেতনতা ও সম্মিলিত প্রয়াসে করোনার পরাজয়ও শিঘ্রই হোক। পবিত্র ক্রুশের শক্তি আমাদেরকে করোনা বিজয়ী হবার উৎসাহ ও শক্তি দান করুন। ✝

"আমার স্বর্গস্থ পিতা তোমাদের ঠিক এভাবেই ব্যবহার করবেন, তোমরা প্রত্যেকে যদি নিজ-নিজ ভাইকে অন্তর থেকেই ক্ষমা না কর।" -মথি:১৮:৩৫

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৩ - ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

১৩ সেপ্টেম্বর, রবিবার

বেন সিরা ২৭: ৩৩–২৮: ৯, সাম ১০৩: ১-৪, ৯-১২,রোমীয় ১৪: ৭-৯, মথি ১৮: ২১-৩৫

১৪ সেপ্টেম্বর, সোমবার

গণনা ২১: ৪খ-৯ অথবা ফিলিপ্পীয় ২: ৬-১১, সাম ৭৭: ১-২, ৩৪-৩৮, যোহন ৩: ১৩-১৭

১৫ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার

শোকার্ত জননী মারীয়া, স্মরণ দিবস

স্মরণ দিবসের খ্রিস্টযাগ, বাণীপাঠ ও ধন্যা কুমারী

হিব্রু ৫: ৭-৯, সাম ৩০: ২-৬, ১৫-১৬, ২০, যোহন ১৯: ২৫-২৭ অথবা লুক ২: ৩৩-৩৫

১৬ সেপ্টেম্বর, বুধবার

সাধু কর্ণেলিয়াস, পোপ ও সিপ্রিয়ান, বিশপ, সাক্ষ্যমর, স্মরণ দিবস

১ করি ১২: ৩১–১৩: ১৩, সাম ৩৩: ২-৫, ১২, ২২, লুক ৭: ৩১-৩৫

১৭ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার

সাধু রবার্ট বেলার্মিন, বিশপ ও আচার্য, স্মরণ দিবস

১ করি ১৫: ১-১১, সাম ১১৮: ১-২, ১৬-১৭, ২৮, ২১, লুক ৭: ৩৬-৫০

১৮ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার

১ করি ১৫: ১২-২০, সাম ১৭: ১, ৬-৮, ১৫, লুক ৮: ১-৩

১৯ সেপ্টেম্বর, শনিবার

সাধু জানুয়ারিয়ুস, বিশপ ও সাক্ষ্যমর, স্মরণ দিবস

১ করি ১৫: ৩৫-৩৭, ৪২-৪৯, সাম ৫৬: ১০-১৪, লুক ৮: ৪-১৫

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৩ সেপ্টেম্বর, রবিবার

+ ১৯৩৮ ফাদার ফ্রান্সিস বোয়ার্স সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮২ ফাদার ফ্রান্সিস বার্টন সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০৯ সিস্টার মেরী ফেলিসিতি পিসিপিএ

১৫ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার

+ ২০০৬ সিস্টার মারী সেলিন এসএমআরএ (ঢাকা)

১৬ সেপ্টেম্বর, বুধবার

+ ১৯৪৩ সিস্টার এম ডসিথি আরএনডিএম
+ ১৯৯২ ব্রাদার প্যাট্রিক লুইস কস্তা সিএসসি (ঢাকা)

১৮ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার

+ ২০১০ ফাদার শিমন তিগ্যা (দিনাজপুর)
+ ২০১০ সিস্টার মেরী বার্ণাডেট পিসিপিএ

১৯ সেপ্টেম্বর, শনিবার

+ ১৯৫৪ সিস্টার এম লরেটো এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ১৯৯১ ফাদার আলফন্স কোড়াইয়া (ঢাকা)
+ ১৯৯৮ ফাদার লুইজি মার্কাটো পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০১৬ সিস্টার শিউলি মেরী গমেজ এসসি (ঢাকা)
+ ২০১৮ সিস্টার ক্যাথরিন গনসালভেস এসসি (খুলনা)

খ্রিস্টমণ্ডলীতে দীক্ষাস্নান

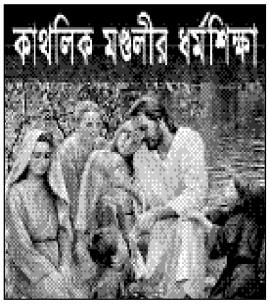

১২৪৫: দীক্ষাস্নান অনুষ্ঠানের সমাপ্তিতে রয়েছে মহা-আশীর্বাদ। নবজাতকদের দীক্ষাস্নান- অনুষ্ঠানে শিশুর মাকে আশীর্বাদ দান একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে।

১২৪৬: "এখনও দীক্ষাস্নাত হয়নি এমন ব্যক্তি এবং একমাত্র সেই ব্যক্তিই দীক্ষাস্নাত গ্রহণ করতে সক্ষম।

১২৪৭: খ্রিস্টমণ্ডলীর আরম্ভ থেকে, বয়স্কদের দীক্ষাস্নান একটি সাধারণ প্রচলন যেখানে মঙ্গলবাণী ঘোষণা এখনও নতুন। অতএব প্রার্থীর ধর্মশিক্ষাকাল (দীক্ষাস্নানের জন্য প্রস্তুতিকাল) একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। খ্রিস্টীয় বিশ্বাস ও খ্রিস্টীয় জীবনে প্রবেশ, প্রার্থীদের মধ্যে এমন মনোভাব জাগিয়ে তোলে যা দীক্ষাস্নান, দৃঢ়করণ ও খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কারে প্রদত্ত ঈশ্বরের দান গ্রহণ করতে সক্ষম করে।

১২৪৮: ধর্মশিক্ষাকালে বা দীক্ষাপ্রার্থীদের গঠনের লক্ষ্য হল ঐশ উদ্যোগের প্রতি সাড়া দেওয়া এবং মাণ্ডলীক সমাজের সঙ্গে মিলন-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে, প্রার্থীদের মধ্যে মনপরিবর্তনের এবং বিশ্বাসের পরিপক্কতা আনয়ন করা। ধর্মশিক্ষাকাল হবে, "সমগ্র খ্রিস্টীয় জীবনে গঠন, যে সময়ে শিষ্যেরা তাদের গুরু খ্রিস্টের সঙ্গে মিলিত হবে। দীক্ষাপ্রার্থীগণকে যথোপযুক্তরূপে পরিত্রাণ রহস্যে ও সুসমাচারীয় গুণাবলীতে গঠিত হতে হবে; এবং পরবর্তী পবিত্র অনুষ্ঠান রীতির মধ্যদিয়ে বিশ্বাসের জীবন, উপাসনা-অনুষ্ঠান এবং ঐশজনগণের ভ্রাতৃপ্রেমের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে।"

১২৪৯: দীক্ষাস্নান-প্রার্থীরা "ইতোমধ্যেই খ্রিস্টমণ্ডলীর সঙ্গে মিলনাবদ্ধ, তারা ইতোমধ্যেই খ্রিস্টের পরিবারভুক্ত, এবং প্রায়শ তারা বিশ্বাস, আশা ও ভক্তি জীবন ইতোমধ্যে যাপন করতে অভ্যস্ত"। "ভালবাসায় ও ভাবনায় মাতামণ্ডলী ইতোমধ্যেই তাদেরকে নিজের বলে আলিঙ্গন করে।"

১২৫০: পতিত মানবস্বভাবে জাত এবং আদিপাপ দ্বারা কলঙ্কিত শিশুদেরও দীক্ষাস্নানে নতুন জন্মলাভের প্রয়োজন রয়েছে, যাতে তারা অন্ধকারের শক্তির কাছ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে, এবং ঈশ্বরের সন্তানগণের স্বাধীনতার রাজ্যে আনীত হতে পারে, যে-রাজ্যে সকল মানুষই আহূত। বিশেষভাবে শিশু দীক্ষাস্নানের প্রকাশিত হয় পরিত্রাণের সম্পূর্ণ আযাচিত অনুগ্রহ। জন্মের অল্পকালের মধ্যে শিশুকে দীক্ষাস্নাত না করলে খ্রিস্টমণ্ডলী ও মাতা-পিতা একটি শিশুকে ঈশ্বরের সন্তান হবার অমূল্য দান থেকে বঞ্চিত করবে।

১২৫১: খ্রিস্টান মাতাপিতাগণ স্বীকার করবে যে, ঈশ্বর যে জীবন তাদের হাতে ন্যস্ত করেছেন সেই জীবনের লালন-পালনকারী হিসেবে তাদের ভূমিকার সঙ্গে এই ব্যবস্থার মিল রয়েছে।

১২৫২: শিশু দীক্ষাস্নানের প্রচলন খ্রিস্টমণ্ডলীর একটি স্মরণাতীত ঐতিহ্য। দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে এই প্রচলনের স্পষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়, এবং এটাও খুবই সম্ভব যে, প্রেরিতদূতদের বাণীপ্রচারের শুরু থেকেই যখন "গোটা পরিবার "দীক্ষাস্নান পেয়েছে, শিশুরাও তার সঙ্গে দীক্ষাস্নাত হয়েছে বলে স্বীকার করা যেতে পারে।

১২৫৩: দীক্ষাস্নান ধর্মবিশ্বাসের সংস্কার। কিন্তু ধর্মবিশ্বাসর জন্য প্রয়োজন খ্রিস্টবিশ্বাসীদের সমাজ। একমাত্র খ্রিস্টবিশ্বাসের মধ্যে থেকে প্রত্যেক খ্রিস্টবিশ্বাসী বিশ্বাস করতে সক্ষম। দীক্ষাস্নানের জন্য প্রয়োজনীয় খ্রিস্টবিশ্বাস পূর্ণ পরিপক্ক নয়, একটি সূচনা মাত্র যা পরবর্তীকালে বিকাশ লাভ করবে। দীক্ষাপ্রার্থী অথবা ধর্মমাতাপিতাকে প্রশ্ন করা হয়: "তোমরা ঈশ্বরের মণ্ডলীর কাছ থেকে কী চাও?" উত্তর হল: "খ্রিস্টবিশ্বাস"।

১২৫৪ : দীক্ষাস্নান শিশু অথবা প্রাপ্ত বয়স্ক সকলেরই খ্রিস্টবিশ্বাসে বেড়ে উঠতে হবে দীক্ষাস্নানের পরে। এই জন্যই খ্রিস্টমণ্ডলী প্রতিবছর পুনরুত্থান নিশিজাগরণ অনুষ্ঠানে দীক্ষাস্নানের প্রতিজ্ঞাসমূহের নবায়ন করে। দীক্ষাস্নানের জন্য প্রস্তুতি কেবলমাত্র নবজীবনের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। দীক্ষাস্নান হলো খ্রিস্টের সেই নবজীবনের উৎস যা থেকে সমগ্র খ্রিস্টীয় জীবন উৎসারিত হয়॥

ক্রুশের মাহাত্ম্য

ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা

খ্রিস্টীয় জীবনে ক্রুশ হল পবিত্র, গৌরব ও বিজয়ের প্রতীক। এই ক্রুশের মধ্যেই পরিত্রাণ নিহিত রয়েছে। এই ক্রুশেই আমাদের ত্রাণদাতা খ্রিস্ট আমার আপনার জন্য জীবন দিয়েছেন। যেন আমরা সবাই পরিত্রাণ লাভ করতে পারি। যখন আমরা ক্রুশ দেখি তখন যিশুর যন্ত্রণাময় মৃত্যুর কথা স্মরণ করি। এই ক্রুশের মধ্যেই রয়েছে খ্রিস্টীয় জীবনের পরিচয়। ক্রুশের চিহ্নের মধ্য দিয়ে যে কোন প্রার্থনা শুরু করা হয় অর্থাৎ ক্রুশ আমাদের শরীরের মধ্যে অঙ্কন করা হয়। আমরা যদি ক্রুশকে নিয়ে ধ্যান করি তাহলে দেখতে পাবো আমাদের প্রত্যেকের জীবনে ক্রুশ রয়েছে। একেক জনের জীবনে একেক ধরনের ক্রুশ রয়েছে। এই ক্রুশকে নিয়েই আমাদের জীবনে এগিয়ে চলতে হয়। "কেউ যদি আমার অনুগামী হতে চায়, তবে সে আত্মত্যাগ করুক এবং নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক *(মথি ১৬:২৪)*।" ক্রুশের পথে রয়েছে জীবন। এই পথে রয়েছে বিজয়। এই পথ ধরেই আমরা শ্বাশতের পথে যাত্রা করি। জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পাই। ক্রুশের মাহাত্ম্যের কথা অন্যদের সামনে তুলে ধরি।

একজন শিশু যখন দীক্ষাস্নান সংস্কার গ্রহণের মধ্য দিয়ে মণ্ডলীতে প্রবেশ করে তখন তার কপালে এই ক্রুশের চিহ্ন একে দেওয়া হয়। খ্রিস্টের সন্তান হিসেবে একজন শিষ্য হিসেবে যেন সে খ্রিস্টের ও নিজের জীবনের ক্রুশ বহন করে চলে। তাই এই ক্রুশের চিহ্নের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। যখন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ কাউকে আশীর্বাদ করেন তখন বেশিরভাগ মানুষ খ্রিস্টীয় কৃষ্টি অনুসারে আশীর্বাদ প্রার্থীর কপালে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে দিয়ে আশীর্বাদ করেন। এই ক্রুশের চিহ্ন তাই আশীর্বাদের চিহ্নও বলা চলে। আবার কেউ-কেউ কোন কাজ বা অন্য কিছু শুরু করার আগে ক্রুশের চিহ্ন দিয়ে শুরু করেন যেন ক্রুশে মৃত্যুবরণকারী পুনরুত্থিত খ্রিস্ট তাঁর কাজকে সুন্দর করে সমাধান করতে সাহায্য করেন। ভয় পেলে বিপদে পতিত হলেও কেউ-কেউ ক্রুশের চিহ্ন করেন। যেন বিপদ থেকে এই ক্রুশ তাকে রক্ষা বা উদ্ধার করতে পারে। যিশুর মৃত্যু, যন্ত্রণা ও পুনরুত্থানের পর থেকেই এই ক্রুশের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বে ক্রুশকে ঘৃণার প্রতীক অপমানের প্রতীক হিসেবে ভাবা হত। শুধু যিশুর কারণে এর অর্থ সম্পূর্ণভাবে বদলে যায়। এই ক্রুশ হয়ে ওঠে মানুষের ভালবাসা ও আনন্দের কারণ। তাই বিভিন্ন দিক থেকে এর মাহাত্ম্য রয়েছে।

খ্রিস্টান হিসেবে আমাদের পরিচয় হল ক্রুশ। তাই অনেক মানুষকে ক্রুশ পরিধান করতে দেখা যায়। আমরা যখন ক্রুশ পরিধান করি তখন যিশুকে আমাদের জীবনে রাখি, হৃদয়ে রাখি, তাকে নিয়ে পথ চলি, তাকে নিয়ে কাজ করি। যিশু যখন আমার সঙ্গে থাকে তখন আমার সব কাজ সুন্দর হওয়ার কথা। আমার মধ্যদিয়ে খ্রিস্টকে প্রকাশ করার কথা। আমি ক্রুশ পরিধান করি ঠিকই কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমার জীবন পরিবর্তন হয় না। আমি আগের মানুষই থাকি। তাহলে আমি যদি নিজের পরিবর্তন করতে না পারি। আমার আমিত্বকে চূর্ণ করতে না পারি। তাহলে আমি কতটুকু ক্রুশের মহিমায় আলোকিত হতে পারছি? অন্যকে ক্রুশের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। আমরা যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাই যদি আমাদের গলায় ক্রুশ থাকে অন্য ধর্মের ভাই-বোনেরা বুঝতে পারে আমরা খ্রিস্টান। খ্রিস্টের অনুসারী। কারণ ক্রুশ আমাদের পরিচয়ের চিহ্ন আমাদের সঙ্গে আছে। অনেক ধর্মীয় সংঘ আছে যারা তাদের সংঘের নির্দিষ্ট ক্রুশ পরিধান করেন। অনেকে এই ক্রুশ নিয়েই সেবাকাজ করতে যান। এই ক্রুশের মধ্য দিয়ে অন্যেরা খ্রিস্টকে দেখতে ও চিনতে পারেন। সেই সাথে যারা ক্রুশ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে তারা খ্রিস্টেরই সেবাকাজ খ্রিস্টের নামে করছেন সেটাও তারা উপলব্ধি করতে পারেন।

আমরা তপস্যাকালে ক্রুশের পথে অংশগ্রহণ করি। সেই সাথে ক্রুশের অর্চনা করি। ক্রুশের দিকে তাকিয়ে শক্তি সঞ্চার করি, আমাদের জীবনের পরিবর্তন করি। যিশুর জীবনের ক্রুশ অর্থাৎ দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে আমার জীবনের দুঃখ কষ্টকে মেলাতে চেষ্টা করি। যখন আমার কষ্ট যিশুর কষ্টের সঙ্গে মেলাই তার চরণে আমার কষ্ট ঢেলে দেই তখন আমার কষ্ট আর কষ্ট থাকে না। আমার কষ্ট হালকা মনে হয়। আমরা মানুষ হিসেবে সবাই নিজেকে অনেক ভালবাসি, অনেক গুরুত্ব দেই। তাই নিজের কষ্ট, বিপদ-আপদ, হতাশা-নিরাশাকে সবচেয়ে বড় মনে হয়। আমরা যদি অন্যের দিকে তাকাই বিশেষ করে ক্রুশের দিকে তাকাই তাহলে আমাদের দুঃখ-কষ্ট লাঘব হবে। ক্রুশ থেকে আমরা শক্তি লাভ করতে পারবো। একবার একজন লোক যার কোন জুতো ছিল না পরিধান করার মত। সে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে তার মনে অনেক কষ্ট। পরক্ষণেই সে দেখতে পেল একজন লোক যাচ্ছে যার একটি পা নেই। সে তখনই ভাবলো আমার তো জুতো নেই কিন্তু এই মানুষটির তো পা নেই। পরক্ষণেই সে তার জুতা না থাকার দুঃখ ভুলে গেলো। আমরা যেন নিজের ক্রুশকে বড় করে না দেখে অন্যের ক্রুশকে বড় করে দেখার চেষ্টা করি। আবার একবার একজন লোক স্বপ্নে দেখল যিশু সবসময় বিপদে পাশে থাকেন এবং ক্রুশ বহন করতে সহায়তা করেন। সে সমুদ্রের তীরে ভ্রমণে গেল। সেখানে সে তার জীবনের ক্রুশ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। আস্তে-আস্তে তার ক্রুশ তার কাছে অনেক ভারী মনে হল। সে দেখল যিশু এবং সে একসাথে পথ চলছে। সে খুবই আনন্দিত হল। পরক্ষণেই সে লক্ষ্য করল সমুদ্রের বালির মধ্যে শুধুমাত্র একজোড়া পা দেখা যাচ্ছে সে যিশুকে দোষারোপ করল আমি যখন বিপদে আমার ভারী ক্রুশ বহন করছিলাম তখন তুমি আমার সঙ্গে ছিলে না। কারণ বালির মধ্যে মাত্র একজোড়া পা দেখা গেছে। যিশু বলেন-বৎস, তুমি যখন ক্রুশ বহন করছিলে তখন আমি তোমাকে আমার কাঁধে নিয়েছি। তাই যে পায়ের ছাপ ওখানে পড়েছে সেই পায়ের ছাপ তোমার নয় আমার। যখন আমি ক্রুশ বহন করি তখন যিশু আমার সঙ্গে থাকেন। আমার সাথে আমার ক্রুশ বহন করেন। ক্রুশ দুটো কাঠকে সাধারণত জোড়া দিয়ে প্রস্তুত করা হয়। সিমেন্ট বা লোহারও হতে পারে। যেটা দিয়েই প্রস্তুত হোক না কেন আড়া-আড়ি ও লম্বা-লম্বি দুটো বস্তু দরকার। অর্থাৎ খ্রিস্ট উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম সব দিকেই রয়েছেন। তিনি সব জায়গায় আছেন, রাজত্ব করছেন। আমার দুঃখ-কষ্টের ক্রুশ বহন করছেন।

কেউ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তার কবরে মাথার ওখানে একটি ক্রুশ দেওয়া হয়। ওখানে লেখা থাকে শান্তিতে বিশ্রাম কর। কারণ ক্রুশ হল পবিত্রতার চিহ্ন। এর মধ্যে রয়েছে শান্তি। এই শান্তি হল পুনরুত্থিত খ্রিস্টের শান্তি। এই শান্তিতেই সে যেন ঘুমিয়ে থাকে। কারণ খ্রিস্ট নিজেই হলেন শান্তিরাজ। পুনরুত্থিত খ্রিস্টের প্রথম বাণী ছিল- "তোমাদের শান্তি হোক *(যোহন ২০:১৯)*।" এই একই শান্তি তিনি আমাদের প্রদান করেছেন আমাদের দুঃখ-কষ্টের ক্রুশ বহন করার মধ্যদিয়ে।

ক্রুশ হল আনন্দের প্রতীক, ভালবাসার প্রতীক, বিজয়ের প্রতীক। এই ক্রুশের প্রতি রয়েছে আমাদের অগাধ ভালবাসা, শ্রদ্ধা। আমরা এই ক্রুশকেই নত মস্তকে প্রণাম করি। এই ক্রুশে রয়েছে জীবন। এই ক্রুশে আছে গৌরব। ক্রুশ হল পবিত্র। আমাদের ত্রাণনাথ এই ক্রুশে মৃত্যুবরণ করে নতুন অর্থ দিয়েছেন। খ্রিস্টযাগে শোভাযাত্রায় সামনে ক্রুশ রাখা হয়। বেদীর পেছনে বা সামনেও ক্রুশ রাখা হয়। এই ক্রুশ রাখার মধ্যদিয়ে আমরা যিশুর কথা স্মরণ করি, সাথে যাত্রা করি। তাই এই ক্রুশে আছে পরিত্রাণ, বিশেষ মাহাত্ম্য। আমরা যেন আমাদের প্রতিদিনকার ক্রুশ বহন করার মধ্যদিয়ে কালভারী পর্যন্ত গমন করি। ক্রুশের মাহাত্ম্যকে স্বার্থক করে তুলি॥ ❑

ক্রুশ খ্রিস্টের ভালোবাসার প্রকাশ

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ

ভূমিকা: পুণ্য শুক্রবারে বেগুনি রঙের কাপড়টি খুলে নিয়ে যাজক দু'হাতে উঁচু করে তুলে ধরে বলেন, 'এই দেখ সেই ক্রুশ, এই ক্রুশের উপরেই মুক্তিদাতা প্রাণ দিয়েছেন। এসো আমরা এই ক্রুশের আরাধনা করি।' এই ক্রুশ হল যিশু খ্রিস্টের মুক্তিদায়ী ভালোবাসার প্রকাশ, যে ক্রুশকে বিশ্বের সকল খ্রিস্ট বিশ্বাসীগণ ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করি। এই পবিত্র ক্রুশই আমাদের দিয়েছে মুক্তি। এই ক্রুশ আমাদের প্রতি যিশু খ্রিস্টের ভালোবাসার চিহ্ন। কেননা এই ক্রুশের উপর তিনি বলিরূপে মানুষের মুক্তির জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন। আমাদেরই পাপের কারণে ক্রুশের উপর তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। তবে প্রভু যিশুর এই মৃত্যু সবকিছুর ধ্বংস নয় বরং গৌরবের। ক্রুশের উপর মৃত্যুবরণ করেই প্রভু যিশু গৌরবান্বিত হয়েছেন। আমাদের সবাইকে তাঁর কাছে টেনে এনেছেন। তাই 'ক্রুশ' আমাদের জীবনে গৌরবের, মুক্তির ও আশার প্রতীক। এই ক্রুশ থেকেই বেরিয়ে আসছে জীবন ও পরিত্রাণ। ক্রুশ গৌরবের প্রতীক, বিজয়ের প্রতীক, আশা ও জীবনের প্রতীক যার উপর মৃত্যুবরণ করে প্রভু যিশু আমাদেরকে পাপের বন্ধন থেকে মুক্ত করেছেন। যিশু বলেছেন "কেউ যদি আমার অনুগামী হতে চায়, তবে সে আত্মত্যাগ করুক এবং নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক" *(মার্ক ৮:৩৪)*। কেননা ক্রুশ হচ্ছে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ। ক্রুশ হলো খ্রিস্টবিশ্বাসীদের পরিত্রাণদায়ী; খ্রিস্টের ভালোবাসার প্রকাশ।

ক্রুশ ভালোবাসার প্রকাশ: ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্রের মধ্যদিয়ে তাঁর ভালোবাসা প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করেছেন। ঈশ্বর পুত্র যিশুখ্রিস্ট আমাদের পাপ ও মন্দতা থেকে মুক্ত করার জন্য এবং সৎ পথে ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি ক্রুশের উপর প্রাণ বির্সজন দিয়ে ঐশ ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন যেন আমরা মুক্তি লাভ করতে পারি। ক্রুশই হলো ঈশ্বরের ভালোবাসার প্রকাশ। কারণ ভালোবাসা হল খ্রিস্টীয় জীবনের প্রাণকেন্দ্র। আর মানুষের পাপের জন্য খ্রিস্ট নিজেকে উৎসর্গ করলেন ক্রুশের ওপর। ক্রুশের মধ্যেই রয়েছে ঈশ্বর-পুত্র যিশুর আত্মত্যাগের প্রকাশ, এই ক্রুশেই রয়েছে শ্বাশত মুক্তি। ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ আমাদের জন্য তাঁর ভালোবাসার প্রকাশ। সৃষ্টির ইতিহাসে দেখতে পাই যে, আদম ও হবা ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে পাপ করলেন। ঈশ্বর তাদের এদেন বাগান থেকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন। এভাবে দিনের পরদিন মানুষ পাপ করতে করতে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। তবুও সৃষ্টির শুরু থেকে আমরা ঈশ্বরের ভালোবাসা লক্ষ্য করি। যদিও মানুষ বার-বার অবিশ্বস্ত হয়েছে। তারপরেও ঈশ্বর তাঁর ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন। ইস্রায়েল জাতি মরুপ্রান্তরে বার-বার বিপথে গিয়েছে, তবুও ঈশ্বর তাদেরকে ভালোবেসে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছেন। নতুন নিয়মেও আমাদের প্রতি ঈশ্বরের গভীর ভালোবাসা উপলব্ধি করতে পারি "আদিতে ছিলেন বাণী, বাণী ছিলেন ঈশ্বরের সঙ্গে, বাণী ছিলেন ঈশ্বর" *(যোহন ১:১)* অর্থাৎ ঈশ্বর নিজে মানুষের মত হয়ে জন্ম নিলেন, যাতে মানুষ আরো কাছে থেকে ঈশ্বরকে আলিঙ্গন করতে পারেন। এমনকি, পাপী মানুষের সাথে একাত্মতা ঘোষণার জন্য নিস্পাপ হয়েও দীক্ষাগ্রহণ করলেন। তিনি এরমধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে অবশেষে মানুষের পাপের জন্য ক্রুশের কাছে নিজেকে সমর্পণ করলেন। ক্রুশে মৃত্যুবরণ করে তিনি তা পবিত্র করে তুললেন। মানুষের পাপের বলি হিসেবে নিজেকেই উৎসর্গ করলেন। ক্রুশ হয়ে উঠলো পাপীর পরিত্রাণ। এভাবেই ঈশ্বর তাঁর পুত্রের অর্থাৎ যিশু খ্রিস্টের মধ্যদিয়ে ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন।

ক্রুশ ঐশ প্রেমের প্রকাশ: ক্রুশের উপরে যিশুর যন্ত্রণাময় মৃত্যুই মানুষের প্রতি তাঁর ঐশ প্রেমের প্রকাশ। যিশু বলেছেন "বন্ধুদের জন্যে প্রাণ দেওয়ার চেয়ে বড় ভালবাসা মানুষের আর কিছুই নেই" *(যোহন ১৩:১৩)*। ঈশ্বরই প্রেম, ভালোবাসার মধ্যে তাঁর পূর্ণ প্রকাশ। তিনি আমাদের ভালোবাসেন তাঁর সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে। তিনি আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলি হয়েছেন। আমাদেরই জন্যে ক্রুশে মৃতুবরণ মেনে নিয়েছেন। তাঁর হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা উজার করে দিয়েছেন। ক্রুশের দিকে তাকিয়ে যুগে-যুগে বহু মহামানব তাঁর ভালোবাসা অন্তরে উপলব্ধি করেছেন। তাঁর ভালোবাসায় আবেগ-আপ্লুত হয়ে রাজা দায়ূদ সামসঙ্গীতের ভাষায় গেয়ে ওঠেছিলেন, "তুমিতো আমায় ঘিরে রাখ সামনে পিছনে চারদিকে, বাহুর বেষ্টনী দিয়ে আমায় আগলে রাখ তুমি *(সাম ১৩৯:৫)*। সাধু পল গালাতীয়দের কাছে তাঁর পত্রে বলেছেন, "খ্রিস্ট আমাকে ভালোবেসেছেন এবং আমারই জন্য ক্রুশে জীবন দিয়েছেন *(গালাতীয় ২:২০)*। ক্রুশে জীবন দিয়ে তিনি পিতার প্রতি ও আমাদের প্রতি অসীম ভালোবাসা ও প্রেম প্রকাশ করেছেন।

ক্রুশ ক্ষমা ও পরিত্রাণের প্রকাশ: যিশু খ্রিস্ট ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ করার মধ্যদিয়ে ক্ষমার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। তাই তো সেই সময় যিশু বলে উঠলেন, "পিতা, ওদের ক্ষমা কর! ওরা যে কী করছে, ওরা তা জানে না! তারা তখন দান চেলে তাঁর জামা-কাপড় নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল" *(লুক ২৩:৩৪)*। খ্রিস্ট মানুষকে এত ভালোবাসলেন আর তাঁর প্রমাণ তিনি মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রকাশ করেছেন সেই ক্ষমার মধ্যদিয়ে। একইভাবে ঈশ্বর তার মুক্তিদায়ী বাণী ঘোষণা করতে যুগে-যুগে বিভিন্ন প্রবক্তাদের প্রেরণ করেছেন এবং কালের পূর্ণতায় তাঁর একমাত্র পুত্র প্রভু যিশুকে আমাদের জন্য দান করেছেন। খ্রিস্ট ক্রুশের উপর প্রাণত্যাগ করে আমাদের মুক্তির পথ খুলে দিলেন এবং বলেছেন, তিনিই সত্য, পথ ও জীবন, তাঁর মধ্যদিয়ে না গেলে কেউই পরিত্রাণ পাবে না। যিশুখ্রিস্ট ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ করার মধ্যদিয়ে আমাদের দিয়ে গেলেন পরিত্রাণ। ক্রুশই ক্ষমা ও পরিত্রাণের প্রকাশ।

ক্রুশ নব-জীবনের প্রকাশ: প্রভু যিশু ক্রুশে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে মানুষের জীবনে নতুন আশা ও নবজীবন এনেছেন। প্রভু যিশুর ক্রুশ হচ্ছে নব-জীবনের প্রতীক। কেননা এই ক্রুশ প্রত্যেক খ্রিস্টবিশ্বাসীর জীবনে আশা ও নতুন জীবনের সঞ্চার করে। কারণ যিশু ক্রুশে মৃত্যুবরণের মধ্যদিয়ে জাগতিক মোহ-মায়া, লোভ-লালসা ও পাপের দিক দিয়ে মৃত্যুবরণ করে এবং প্রভু যিশুর পুনরুত্থানের মধ্যদিয়ে নতুন জীবনে প্রবেশ করেছেন। প্রভু যিশুর ক্রুশ আমাদের সকল প্রকার জাগতিক মায়ামোহ ও ভোগবিলাসিতা থেকে মুক্ত করে নতুন জীবনের আশা ও আলো দেখায়। যিশু খ্রিস্ট হলেন সকল মানুষের মুক্তিদাতা। যিশু খ্রিস্ট ক্রুশে মৃত্যুবরণ করার মধ্যদিয়ে তিনি

মানুষকে নব-জীবন দিয়েছেন কারণ পূর্ণাঙ্গ মুক্তির মধ্যে রয়েছে আত্মা ও দেহের মুক্তি আর সেটা হতে পারে ব্যক্তিগত মুক্তি বা মানব জীবনের মুক্তি। তবে যিশু খ্রিস্ট ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ করার মধ্যদিয়ে আমাদের দিয়েছেন আধ্যাত্মিক মুক্তি। আর সেই মুক্তির মধ্যদিয়ে আমরা পেয়েছি নব-জীবন। ক্রুশ হচ্ছে নব-জীবনের প্রকাশ।

ক্রুশ প্রেরণার প্রকাশ: কথায় আছে ভোগে নয় ত্যাগেই সুখ। ঠিক তেমনিভাবে কষ্টের মধ্যদিয়ে যে আনন্দ লাভ করা যায় তা জীবনকে আরো সমৃদ্ধশালী করে। কিন্তু মানুষের জীবনে কষ্টের কোন সীমা বা রেখা নেই, যার কারণে একটি কষ্ট থেকে উত্তরণের পরক্ষণেই অনায়াসে অন্য কষ্টগুলো মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এ যেন জীবনের এক কালচক্র। কিন্তু যদি কষ্টগুলো নিজের মধ্যে রেখে দেওয়া হয় তা কমে না বরং বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেজন্য আমরা যখন কষ্টগুলো যিশুর কষ্টের সাথে মিলাতে পারি, তখন সেগুলো কিছুটা হলেও আমাদের জীবনে শান্তির ও আশার সুবাতাস বয়ে নিয়ে আসে। সেজন্য আমরা কষ্টের মাঝেও যখন ক্রুশকে আলিঙ্গন করতে পারি তা আমাদের এক প্রত্যাশার আলোতে প্রবেশ করতে সাহায্য করে। ব্যক্তি জীবনে আমরা কখনো ক্রুশকে আলাদাভাবে দেখতে চাইলেও, তা সম্ভব হয়ে ওঠে না কারণ ক্রুশ ও জীবন দু'টো বিষয়ই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সে কারণে ক্রুশকে জীবন থেকে আলাদা করে রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের জীবনে ক্রুশ আছে বলেই আমরা জীবনের স্বাদ পেতে সমর্থ হই। আর এই ক্রুশ বলতে শুধুমাত্র আড়াআড়িভাবে জোড়া লাগানো দু'টো কাঠের দণ্ডকে বোঝায় না বরং মানুষের সামগ্রিক সত্ত্বাকে স্পর্শ করে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের জাগতিক, শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিষয় হতাশা-নিরাশা, দুঃখ-যন্ত্রণা রয়েছে। তেমনি রয়েছে মুক্তির পথ। আর সেটি হলো ক্রুশের মধ্যদিয়ে যিশুর সাথে যাত্রা।

ক্রুশ প্রত্যাশার প্রকাশ: ক্রুশ আমাদের কাছে প্রত্যাশার প্রকাশ। কারণ আমাদের জীবন শুধু মৃত্যুর পরেই শেষ নয় বরং মৃত্যুর পরেও আমরা স্বর্গস্থ পিতার সাথে মিলিত হবো। আর এই অসম্ভব বিষয়টি সম্ভব হয়েছে যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্যদিয়ে। যিশুর ক্রুশের সাথে আমরা যেমন আধ্যাত্মিকভাবে পাপের দিক দিয়ে মৃত্যুবরণ করি। তেমনিভাবে যিশুর পুনরুত্থানের মধ্যদিয়ে আমরা নতুন জীবন লাভ করেছি এবং স্বর্গীয় পিতার সাথে মিলিত হওয়ার যোগ্যও হয়ে ওঠেছি। ফলে ক্রুশ আমাদের কাছে সব সময়ই প্রত্যাশার সাক্ষ্যদান করে। তাই নিসন্দেহে এটি অনুমেয় যে, জীবনের যে কোন মুহূর্তে বা পরিস্থিতিতে ক্রুশ হয়ে ওঠে আশার আলো ও প্রত্যাশার নিদর্শন। তাই সাধু-সাধ্বীরা ক্রুশকে আলিঙ্গন করেছেন। নিজের জীবনে দুঃখ-কষ্টকে গভীরভাবে ধ্যান করে তাদের নিজের জীবনে ক্রুশের মহিমা দেখতে পেয়েছেন। আমরাও তেমনিভাবে ক্রুশ প্রত্যাশা রাখি।

পরিশেষে: প্রভু তোমার ক্রুশ আছে বলে। গানের কথার মতোই বলতে হয়, আসলে ক্রুশ আছে বলেই মানুষ পাপের অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে। প্রতিদিনকার জীবনে সংগ্রাম করে বিজয়ী হয় এবং লাভ করে এক নতুন অনুভূতির। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে সমস্ত বাঁধা বা সমস্যর সম্মুখীন হই। তা যদি যিশুর ক্রুশের সাথে মিলিয়ে দেখি তাহলে সেগুলো কষ্টে পরিণত না হয়ে বরং শক্তিতে পরিণত হবে। যা আমাদের আশান্বিত করবে। কেননা ক্রুশই আমাদের একমাত্র ভরসা। ক্রুশ খ্রিস্টের ভালোবাসা ও ক্ষমার শ্রেষ্ঠতম উদাহরণ। যিশুর ক্রুশীয় মৃত্যু ও বিজয় মানব জাতির জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ। এই ক্রুশ যদি না থাকতো তবে যিশু ক্রুশবিদ্ধ হতেন না। এই ক্রুশ না থাকলে প্রবাহিত হতো না শ্বাশত জীবনধারা। তাই এই ক্রুশ কত মহান, কত মহৎ। এই ক্রুশই খ্রিস্টের বিজয়মুকুট ও সিংহাসন। এই ক্রুশেই আমাদের পরিত্রাণ নবজীবন। ক্ষমা ও ভালবাসার চেতনা। ক্রুশই বয়ে এসেছেন পুনরুত্থান। তাই ক্রুশের মহিমা এত অপার। ক্রুশচিহ্ন দিয়েই আমাদের জীবনের শুরু। ক্রুশের আদর্শেই জীবনের গতি এবং ক্রুশের চিহ্ন দিয়েই আমাদের সমাধি। এই ক্রুশই আমাদের পরিচয়। পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসবে ঘোষণা করি, ক্রুশ খ্রিস্টের ভালোবাসার প্রকাশ। আমাদের জয়, আশা ও আনন্দ। ক্রুশ হল আমাদের বিজয় লাভের প্রকৃত পথ ও একমাত্র আশা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, সজল ও খ্রীস্তিয়াঁ মিংঙো এস. জে. (সম্পাদিত): মঙ্গলবার্তা, জেভিয়ার প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১১।

২. ডি' রোজারিও, প্যাট্রিক (সম্পাদিত): কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, জেরী প্রিন্টিং, ঢাকা, ২০০০॥ ❑

খ্রিস্টীয় পরিবারে কথা বলা ও শোনার গুরুত্ব

(১৩ পৃষ্ঠার পর)

- ব্যক্তির চিন্তা ও অনুভূতিগুলোকে প্রকাশ করতে উৎসাহিত করুন;
- আপনি যে তাকে বুঝতে পারছেন এবং তাকে মর্যাদা ও সম্মান দিচ্ছেন তাকে সেটি বুঝতে দিন;
- ব্যক্তিকে কোনো মিথ্যা আশ্বাস দেবেন না। 'আপনার আত্মহত্যা করার মতো কোনো কারণ নেই!' এই ধরনের কথা পরিস্থিতিকে আরো নাজুক করে তুলতে পারে;
- তার দক্ষতার বিভিন্ন দিক ও অর্জনগুলো তার সামনে তুলে ধরুন;
- তাকে নিশ্চয়তা দিন যে, তার সমস্যা সমাধানের বিকল্প আরো অনেক পথ রয়েছে;

যখন আপনি একজন সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন তখন তাকে উপদেশ/পরামর্শ/শিক্ষা/সান্ত্বনা দেওয়া, নিজেকে বড় মনে করা, অনুভূতি প্রকাশে বাঁধা, সহানুভূতি দেখানো ও ভূল শুধরানো থেকে বিরত থাকুন। কারণ এগুলো আপনার সাথে তার আস্থার সম্পর্ক গঠন ও কার্যকর আলোচনা করতে বাঁধার সৃষ্টি করবে। অর্থাৎ আপনার কথা বলার সময় শব্দ চয়নে আপনাকে যথেষ্ট সচেতন থাকতে হবে।

পরিশেষে আমরা আপনাকে আরো একবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আপনার পরিবারের সদস্য ঈশ্বর প্রদত্ত একটি উপহার এবং তার যথাযথ যত্ন, স্নেহ ও সংরক্ষণ করা স্বয়ং ঈশ্বরকে ভালোবাসার সমান *(১ যোহন ৪:২৮ পদ)*। পরিবার, সমাজ ও দেশের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনায় রেখে আসুন আমরা নিজের কষ্টের কথা অন্যের সাথে সহভাগিতা করি এবং অন্যের কথা মনোযোগ ও সহমর্মিতার সাথে শুনি। পবিত্র বাইবেলের আরো একটি বাণী দিয়ে শেষ করতে চাই, "এসো তোমরা, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যারা। জগতের সৃষ্টির সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের দেওয়া হবে বলে রাখা আছে, তা এবার তোমরা নিজেদের বলেই গ্রহণ কর। কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে; আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম, তোমরা আমাকে জল দিয়েছিলে...আমি তোমাদের সত্যই বলছি, আমার এই তুচ্ছতম ভাইদের একজনেরও জন্যে তোমরা যা কিছু করেছ, তা আমারই জন্য করেছো *(মথি ২৫: ৩৫-৪০ পদ)*।" ❑

ক্রুশে পরিচয়, ক্রুশেই পরিত্রাণ

সৌমিক মোল্লা

খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসাবে ক্রুশের সাথে আমরা প্রত্যেকে খুবই পরিচিত। সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আমরা দেখি যে, ক্রুশ হলো দুই টুকরা কাঠ মাত্র। কিন্তু খ্রিস্টীয় জীবনে এই ক্রুশের মাহাত্ম্য বা গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ ক্রুশেই খ্রিস্ট-ধর্মাবলম্বীদের পরিচয় এবং পরিত্রাণ।

যিশু খ্রিস্টের মৃত্যুর পূর্বে ক্রুশ ছিলো ঘৃণার বস্তু। তখনকার সময়ে যারা মারাত্মক পাপ বা অপরাধ করতো, যারা ক্রীতদাস এবং রাজদ্রোহী ছিলো তাদের একমাত্র কঠিন ও লজ্জাজনক শাস্তি ছিল ক্রুশীয় মৃত্যু। কিন্তু ত্রাণকর্তা যিশু খ্রিস্টের মাধ্যমে এই ক্রুশ হয়ে ওঠেছে পবিত্র। তিনি মানব জাতির পরিত্রাণের লক্ষ্যে ক্রুশের লজ্জাজনক মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন। আর ক্রুশকে করেছেন পবিত্র। খ্রিস্ট-মণ্ডলীতে ক্রুশ হয়ে ওঠেছে আরাধ্য ও পূজনীয় বস্তু। খ্রিস্টের ক্রুশ মণ্ডলীর পরিচয় বা চিহ্ন।

'ক্রুশের চিহ্নে আমি হয়েছি চিহ্নিত
যে ক্রুশেতে প্রভু যিশু হলেন সমর্পিত।'
(গীতাবলী-১২৬৩)

ক্রুশ চিহ্নের মাধ্যমে আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনের যাত্রা আরম্ভ হয়। দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে আমরা মণ্ডলীভুক্ত হই বা খ্রিস্টমণ্ডলীর একজন সদস্য হই। সেই সাথে আমরা দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে রাজকীয়, যাজকীয় ও প্রাবক্তিক দায়িত্ব লাভ করি। দীক্ষাস্নানের সময়ে যাজক শিশুর কপালে ক্রুশ চিহ্ন অঙ্কিত করেন। আর আমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, ক্রুশের চিহ্নেই আমরা চিহ্নিত বা আমাদের পরিচয় এই ক্রুশের মাধ্যমে। সুতরাং আমরা খ্রিস্টীয় জীবন-যাত্রার শুরুতেই ক্রুশকে স্বীকার করি। যা প্রত্যেকজন খ্রিস্ট-ধর্মাবলম্বীর পরিচয় বহন করে।

পবিত্র বাইবেলে দেখি যে, যিশু বলেন "কেউ যদি আমার অনুগামী হতে চায়, তবে সে আত্মত্যাগ করুক এবং নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক" *(মথি: ১:২৪ পদ)*। অতএব খ্রিস্টের অনুসারী হতে হলে আমাদের জীবনে ক্রুশের গুরুত্ব রয়েছে। প্রভু যিশু যে পথের পথিক, তাঁর অনুগামীদেরও সেই পথের পথিক হতে হবে। যেসব ব্যাপার আমাদের পার্থিব স্বার্থ ও খ্রিস্টীয় কর্তব্যের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নিয়ে আসে, সেই সব ব্যাপারে ত্যাগের পথ বেছে নিয়ে যিশুকে অনুসরণ করতে হয় ও তাঁর পথের অনুগামী হতে হয়। ক্রুশ আমাদের জীবনকে খ্রিস্টের পথে নিয়ে যায় ও খ্রিস্টের ন্যায় আত্মত্যাগী হতে উৎসাহিত করে। ক্রুশের পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার মাধ্যমে আমরা খ্রিস্টের একজন শিষ্য হয়ে উঠি এবং খ্রিস্টমণ্ডলীর একজন প্রকৃত সদস্য হই।

ক্রুশকে আমি ভালবাসি, ক্রুশকে করি
ভক্তি।

ক্রুশই আমার জীবন মরণ, ক্রুশই আমার
মুক্তি। (গীতাবলী-৯৮৫)

মানব মুক্তির ইতিহাসে ক্রুশ অনন্য এবং অদ্বিতীয়। "বিনাশ পথের যাত্রী যারা, ক্রুশের বাণী তদের কাছে মূর্খতারই নামান্তর; কিন্তু পরিত্রাণ পথের যাত্রী যারা আমাদের কাছে সেই বাণী পরমেশ্বরের আপন শক্তিরই নামান্তর" *(১ করিন্থীয়: ১:১৮ পদ)*। যারা ক্রুশবিদ্ধ মুক্তিদাতাকে অস্বীকার করে বা অবজ্ঞা করে, তারা এই প্রমাণ করে যে তারা মুক্তি পথের যাত্রী নয় বরং বিনাশের পথেরই যাত্রী। খ্রিস্টান হিসাবে আমরা প্রত্যেকে যিশুর ক্রুশীয় মৃত্যু স্বীকার করি এবং তার পুনরুত্থানের মহাপর্ব আনন্দের সাথে পালন করি। খ্রিস্টের এই মৃত্যুবরণ মানব মুক্তির পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। আমরা প্রত্যেকজন খ্রিস্টান ক্রুশকে ভালবাসি, ক্রুশের ভক্তি, আরাধনা ও পূজা করি। ক্রুশের মাধ্যমে আমরা আমাদের সকল পাপময়তা থেকে মুক্তি লাভ করি। সুতরাং ক্রুশেই মানব পরিত্রাণ নিহিত॥ ❑

চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্যের আবেদন

আমি অঞ্জনা বৈদ্য, খুলনা ধর্মপ্রদেশের খালিশপুরের সেন্ট মেরীস ধর্মপল্লীর একজন সদস্যা। আমার স্বামী পিযুষ বৈদ্যর মূত্রথলীতে টিউমার হওয়ায় চিকিৎসকের পরামর্শে অপারেশন করা হয়েছে। যে অপারেশন বেশ ব্যয়সাপেক্ষ ছিল। অপারেশনের পর থেকেই ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী কেমোথেরাপি দিয়ে আসা হচ্ছে। গত ০৯ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে ১২টি কেমোথেরাপি দেয়া শেষ হয়েছে। মাঝখানে (০২) দুই মাস ভালই ছিল। হঠাৎ করে বিগত এক সপ্তাহ যাবৎ প্রস্রাবের রাস্তা (Penis) ফুলে যায় ও ভীষণ যন্ত্রণা শুরু হওয়ায়, ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হই ও ডাক্তারের পরামর্শে বিভিন্ন টেস্ট ও সিটিস্কেন করা হয়। ডাক্তার রিপোর্ট দেখার পর জরুরীভাবে ৩টি কেমোথেরাপি নেওয়ার পরামর্শ দেন, যার খরচ বাবদ প্রায় লক্ষাধিক টাকারও বেশি প্রয়োজন। ইতোমধ্যে স্বামীর চিকিৎসা করতে-করতে আমরা প্রায় নিঃস্ব হয়ে গেছি। আপনাদের আর্থিক সহায়তাই পারে আমার স্বামীকে ও একটি পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখতে। ঈশ্বর আমাদের সবাইকে রক্ষা ও আশীর্বাদ করুন।

নিম্ন ঠিকানায় আর্থিক সাহায্য পাঠানোর অনুরোধ করছি

পিযুষ বৈদ্য
একাউন্ট নং : ২৬০৩২/৮
জনতা ব্যাংক লিমিটেড
খালিশপুর শাখা, খুলনা
মোবাইল: ০১৭৩২৩৪৪৩৭৭

পাল-পুরোহিত
সেন্ট মেরীস ধর্মপল্লী, মুজগুনি
খালিশপুর, খুলনা

ধরিত্রী আবাসভূমির পরিবেশ সংরক্ষণে প্রকৃতির ও মানবের প্রযুক্তির ভূমিকা

বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি

(পূর্ব প্রকাশের পর)

তৃতীয় ধাপে শেষে, ১৯শ-২০শ শতাব্দীতে মানবীয় প্রজ্ঞা ও কর্মদক্ষতা আরও ব্যাপক হয়ে ও প্রাধান্য পেয়ে মানব জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নতুন সামর্থ পেয়েছে, যা বিগত দু'শ বছর ধরে "শিল্প প্রযুক্তি বিপব" (Industrial Revolution) হয়ে উন্নয়নের প্রধান পথ বলে গণ্য হয়ে আসছে। এ সময়ে ঐশ প্রজ্ঞা ও কর্মময়তা এবং সৃষ্ট প্রকৃতির মাঝে তার অবস্থানের কথা একেবারেই বাদ পড়ে যাচ্ছে; মানবীয় প্রজ্ঞা-প্রযুক্তি ও কর্মদক্ষতার ওপর সর্বজনীন নির্ভর চলে আসছে; এবং ***দ্বিতীয় ধাপের*** চেয়ে এখন মানবীয় প্রজ্ঞা-প্রযুক্তি ও কর্মময়তা মানবের এবং প্রাণী ও প্রাণসমূহের ভিতরের অন্তরকে নিয়ে আর নয়, বরং বাইরের জড় পদার্থ ধাপ ও সার্বিক জড় জগতকে নিয়ে বেশি মগ্ন হয়েছে, এমনকি সমগ্র ভিতর-অন্তরের সামগ্রীকে বাইরের জড়সামগ্রীর প্রযুক্তি ও রসায়নাদি দিয়ে প্রকাশ করতে এবং এমনকি রচনা করতে সবিশেষ অনুরাগী।

দু'হাজার বছরের এই দীর্ঘ ইতিহাসে মানবের প্রজ্ঞা ও কর্মময়তার সরস অংশগ্রহণ ও বিকাশ খুব শুভ বিষয়। তবে দীর্ঘ এই যাত্রাপথে ইতিহাসে গৃহিত ধর্মীয় শাস্ত্রগ্রন্থে এবং সমগ্র সৃষ্টির প্রকৃতিতে প্রকাশিত উর্ধ্বতম ঐশ প্রজ্ঞা ও কর্মক্রিয়ার ভিত থেকে ধীরে-ধীরে দূরে চলে আসা এবং মানবীয় ও সৃষ্টির অন্তর-আত্মার সামগ্রী থেকে সরে এসে বাইরের জড়সামগ্রীর প্রতি অত্যাধিক ও এক তরফা মনোযোগী ও মগ্ন হওয়া সার্বিক শুভ গতিকে ব্যাহত করছে। এখন প্রয়োজন, উর্ধ্বতম ঐশ প্রজ্ঞা ও কর্মক্রিয়া ও মানবের প্রজ্ঞা ও কর্মময়তা এবং মানবসহ সৃষ্টির অন্তর-আত্মা ও সমগ্র জড়জগৎ, এই চারের মাঝে যথার্থ সংযোগ ও পারস্পরিক চলাচল রক্ষা করতে পারা।

এতগুলো শতাব্দীর বহু শুভ ইঙ্গিত এ সব উন্নয়নের মাঝে দেখা যায়; তবে এর মাঝে আছে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ সব যুগে, এবং বিশেষভাবে বিংশ শতাব্দীতে ঘটেছে ২টি মহাযুদ্ধ বিপর্যয় এবং সামগ্রিকভাবে ন্যায্যতা, নৈতিকতা ও শান্তির পথে পৃথিবী বহুভাবে অশান্ত।

তবে বিগত দুইশ বছরে পৃথিবীতে সমাজ ও ধর্মীয় আলোচনায় দরিদ্রদের পক্ষ সমর্থনের কথা ব্যাপকভাবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। এটি খুবই ইতিবাচক আধ্যাত্মিক চেতনা, যা প্রকাশ করে যে পৃথিবী আত্মিক সামর্থ নিয়ে চলতে পারে। দরিদ্রদের নিয়ে আলোচনাটি ৫টি ধাপে ক্রমবিকশিত হয়েছে: ***প্রথমত***, দরিদ্রদের জন্য জাগতিক সম্পদের প্রয়োজনের কথা দিয়ে; ***দ্বিতীয়ত***, জাগতিক প্রয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে তাদের অন্তরের মান-মর্যাদার সম্পদের প্রয়োজনের কথা; ***তৃতীয়ত***, বলা হয়েছে যে, দরিদ্র মানুষ শুধু গ্রহিতা নয়, বরং সবার সাথে উন্নয়ন ও কৃষ্টির রচনাকারীও বটে, যার ওপর ভিত্তি করে ***চতুর্থত,*** পর্যায়ে বলা হয়েছে ধনী ও দরিদ্রের মাঝে সংহতি ও একাত্মতার কথা; এবং এর পরিণতি হিসেবে ***পঞ্চম*** পর্যায়েও এসেছে জীবন-মূল্যবোধে দরিদ্রদের সহজ-সরল জীবনকেই বরং বরণ করার আমন্ত্রণ জানিয়ে।

"হোক তোমার প্রশংসা" পত্রটি দরিদ্রদের পক্ষ সমর্থনের বিষয়টিকে আরও একটি নতুন ধাপে এগিয়ে নিয়েছে: পৃথিবীর বুকে ব্যাপক শুভ দরিদ্রতার মানুষকে এবং আরও ব্যাপক শুভ দরিদ্রতায় ভঙ্গুর প্রকৃতিকে একত্বে যত্ন ও সমন্বিত করে নিয়ে প্রত্যাশিত যথার্থ মানব উন্নয়নের ভিত্তি গড়ে তোলা *(# ২৩৭)*। উল্লেখ্য যে, ১৯৭২ জলবায়ু নিয়ে জাতিসংঘের প্রথম আলোচনায় ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পরিবেশ সংরক্ষণ ও দারিদ্র্য মোচনকে একটি সমন্বিত বিষয় বলে উল্লেখ করেছিলেন।

বর্তমান যুগে প্রকৃতির বৃহত্তর প্রযুক্তির প্রতি অনিহা : মানব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতি এক তরফা মনোনিবেশ ও অনুরাগ মানুষকে সমগ্র সৃষ্টি ও প্রকৃতিতে তার সৃষ্টিকর্তার আরও বৃহৎ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতি অনুরাগ ও নির্ভরশীলতা থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে, প্রকৃতিকে তুচ্ছ মনে করা হচ্ছে। বস্তত মানব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রকৃতির আরও ব্যাপক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সূত্র ও প্রয়োগ থেকে সংগ্রহণ। তাতে প্রকাশ পায় যে, আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চেয়ে প্রকৃতির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সর্বদাই অধিক সমৃদ্ধ, যেন, সেখানে "আরও একটি অধিক প্রযুক্তি" রয়েছে; এবং আমরা প্রকৃতির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল ও ঋণী। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের প্রযুক্তির শ্রেষ্ঠ কৃত্রিম ফুলের চেয়ে প্রকৃতির প্রযুক্তির সহজ ফুলটি আরও অধিক প্রযুক্তি দিয়ে রচিত, যা আমরা দিন-দিন অনুসরণ করে চলছি শেষে প্রকৃতির পরিণত প্রযুক্তির ফুলটির মত করার লক্ষ্যে। আরও সহজ ও বুদ্ধিমান হত আমাদের বুদ্ধিমত্তা ও শ্রম দিয়ে প্রকৃতিতে ইতোমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ফুলটিরই সামনের ধাপটির লক্ষ্যে অধিক যত্ন নেয়া ও বিকশিত করা।

দীর্ঘদিনের প্রকৃতিজাত বস্তু ও প্রাণসমূহ অধিক মানসম্পন্ন : বর্তমান সময়ে আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রকৃতির বস্তু ও জীবসমূহের পদার্থ, রসায়ন ইত্যাদিকে বিভাজন করে নিয়ে তাদের একক পদার্থ ও রসায়নকে ইচ্ছামত একত্রিত করে নতুন বস্তু ও জীব তৈরি করতে অতিশয় আগ্রহী, যার ফলে শুরু হয়েছে লাগামহীন হাইব্রিড ও কৃত্রিম বস্তু ও প্রাণী তৈরী, প্রজনন ইত্যাদি। এগুলোই অধিকতর সমৃদ্ধ ও তাক লাগানো অর্জন বলে বিবেচিত হচ্ছে এবং প্রকৃতিগত বস্তু ও জীবকে নিকৃষ্ট ও সেকেলে বিবেচনা করে তার প্রতি গভীর অনিহা সৃষ্টি হচ্ছে।

তবে মানব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্বারা সৃষ্ট এবং বিশ্বপ্রকৃতির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্বারা সৃষ্ট বস্তু ও জীবের ভিতরের মান নিয়ে বেশ-কম খেয়াল করা প্রয়োজন। বিশ্ব-প্রকৃতির সমস্ত বস্তু ও জীব নিজ-নিজ মৌলিক পদার্থ বা রসায়নগুলিকে নিয়ে যত্রতত্রভাবে সৃষ্ট বা তৈরী নয়, বরং তাদের নিজ-নিজ মৌলিক পদার্থ-রসায়নগুলো দীর্ঘদিন একসাথে চলে চলে নিজেদের ভিতরের নির্যাসে একাত্ম হয়ে গিয়ে একে অপরের সাথে বহুকালের পরিচিত "বান্ধব" হয়ে ওঠে; এবং সেই প্রক্রিয়ায় ভিতরের নির্যাসে একাত্ম হওয়ার কারণে সবার ভিতরের "স্বাদ" মিলিত ও এক করে প্রকাশ করতে পারে; তাতে তারা "শ্রেষ্ঠ" হয়, "মানগতভাবে" অধিক সমৃদ্ধ হয়। অপরদিকে আমাদের যত্রতত্র হাইব্রিডায়ন, জেনেটিক হেরফের করণ, কৃত্রিম প্রজনন ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় বস্তু ও জীবের মৌলিক পদার্থ-রসায়নসমূহ পরস্পরের কাছে হঠাৎ অপরিচিত "আগন্তুক" হয়ে আসে বলে নিজেদের ভিতরের নির্যাসে "এক স্বাদে" তৎক্ষণাত একাত্ম হয়ে আসতে পারে না বলে "শ্রেষ্ঠ" হয় না; তাই তারা মানগতভাবে অধিক দুর্বল থেকে গিয়ে বরং মাত্র "পরিমাণগতভাবে" অধিক সবল হয়।

প্রকৃতির প্রযুক্তির বাস্তবতা ও সম্ভাবনা অনেক ব্যাপক ও সীমাহীনভাবে উন্মুক্ত; আমাদের চয়নকৃত সীমিত প্রযুক্তির হাতে চলে আসলে তার উন্মুক্ত বাস্তবতা, সম্ভাবনা ও প্রসার সীমিত হয়ে আসবে। উদাহরণস্বরূপ, নদী-নালা ও খাল-বিলের মাছের প্রকার, সংখ্যা ও খাদ্য ব্যবস্থা কত ব্যাপক; প্রক্রিয়াটি ব্যাপক নদী-নালা-খাল-বিলের প্রণালী থেকে সরিয়ে নিয়ে আমাদের পুকুরের ক্ষুদ্রতর ও সীমানাকৃত প্রণালীতে নিয়ে এলে ওটির ব্যাপক "সীমিতকরণ" হবে। ফলে আমাদের সীমিত প্রযুক্তির

প্রভাবে প্রকৃতির বহুল প্রযুক্তি সীমিত হতে থাকবে।

প্রকৃতির প্রযুক্তিতে মিলন ও একাত্মতা: প্রকৃতির সমস্ত বস্তু ও জীবের গঠনের সুক্ষ্মতম অণু (molecule), যেমন ক্ষুদ্রতম "ডি-এন-এ"-কেও বিশেষণ করে দেখা যায় যে, সেটিও একক নয় বরং কয়েকটি নির্ধারিত পদার্থ বা রসায়নের সমন্বিত মিলনে গঠিত; তেমনিভাবে ক্ষুদ্র-বৃহৎ যে বস্তু ও জীব। সৃষ্টি ও প্রকৃতিতে এককভাবে বড় বা ছোট হওয়া আসল কথা নয়, বরং এককভাবে বড় বা ছোট যা-ই হোক, তার মধ্যে পরস্পরের মিলন বা এক হওয়ার যতটুকু সামর্থ, তা ততটুকু "শ্রেষ্ঠ"। *(জর্জ মেলের গবেষণার আলোচনা লক্ষ্যণীয়।)* কেন পদার্থ ও রসায়নের এমন মিলন হয়, একে অপরকে আপন করে গ্রহণ করা হয়, একে অপরের "গৃহ" স্বরূপ হয়, তা এখনও ওদের, তথা প্রকৃতির, অন্তরের "দুর্ভেদ্য দূর্গ"; তা এখনও আমাদের বিজ্ঞানের গবেষণার উর্ধ্বে! প্রকৃতিতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য "একাত্মতা, মিলন ও বন্ধুত্ব"-এর এই প্রক্রিয়া বহুকালের ও বহু ব্যাপক, ও সর্বজনীন; আমাদের প্রযুক্তির কৃত্রিমায়ন এখনও গবেষণার প্রক্রিয়ায় তাৎক্ষণিক এবং অতি ক্ষুদ্র। আমাদের প্রযুক্তির ক্ষুদ্রতর কৃত্রিমায়ন প্রক্রিয়াকে প্রকৃতির প্রযুক্তির ব্যাপক পরিণত প্রক্রিয়ার নিয়মের ওপর ভিত্তি করে ও তার সাথে সমন্বিত করে নিয়ে চলা দরকার।

গ. পৃথিবীতে মানব জীবনও মিলন ও একাত্মতার জীবন: পদার্থরূপ দেহ এবং নিরাকার আত্মার মিলনে গঠিত মানুষ সত্ত্বা সবচেয়ে আশ্চর্য সৃষ্টি! সেখানেই তার শ্রেষ্ঠতা, এবং তা পরিপূর্ণ করতে করতে চলা মানুষের চিরকালীন কঠিন দায়িত্ব ও পরিশ্রম। ইতিহাসে এ ব্যাপারে মানুষ প্রায়ই এদিক-সেদিক হয়ে পড়ে পূর্ণতার পথে চলে।

রেনেসাঁ যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান শিল্পায়নের যুগ পর্যন্ত শুভ অর্থেই মানুষ নিজ বুদ্ধিমত্তা ও কর্মমত্তার ওপর জোর দিয়ে চলেছে; তবে নিজ প্রজ্ঞা ও কর্মদক্ষতার সামর্থে এবং স্বাধীনতায় বিমুগ্ধ হয়ে মানুষ "স্বয়ংসম্পূর্ণ ও একক" হওয়ার চেতনায় মুগ্ধ ও আনন্দিত হয়ে মানুষ অনেকভাবে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের ওপর এবং ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট প্রকৃতির ওপর নির্ভর কম করে দেখছে।

তাই মানুষকে তার পূর্ণ ও পরিণত সত্তা সম্বন্ধে আরও মনোযোগি হওয়া প্রয়োজন: ***প্রথমত,*** মানুষ তার বাহ্যিক ও জাগতিক কর্মধারায় "কর্মময় মানুষ" ("homo faber") সে প্রায়োগিক শিল্প ও প্রযুক্তির কর্মধারার মানুষ, যা বর্তমান শিল্পায়নের যুগে খুবই প্রবল। তবে অন্তরের ও পারমার্থিক কর্মধারায় মানুষ "আত্মিক মানুষ" ("homo spiritalis") হয় ঐশভাবাপন্ন, সৌন্দর্য, সাহিত্য, দর্শন, সহমর্মিতায় ধর্মানুরাগী মানুষ, যে বিষয়টির প্রতি মনোযোগ বর্তমান যুগে বেশ দুর্বল। শেষে গভীরতম ধাপে, মানুষ তার অন্তর ও বাহির, জাগতিক ও পারমার্থিক সবকিছু একাকার করে নিয়ে "মিলনকারী মানুষ" ("homo consciens") অর্থাৎ ধ্যানময় (contemplative) মানুষ হয়। তখন সে "দায়িত্ববান" মানুষ, কেননা তখন সে অন্যের প্রতি মনযোগী ও সব কিছুর সাথে মিলনের সত্তা।

"ফরাসী বিপ্লব"- উত্তর যুগে মানুষের শুভ ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অধিকার বিষয়টি বর্তমানে অনেকভাবে "একক" স্বাধীনতা ও অধিকার হয়ে প্রাধান্য পাচ্ছে; ঐ "একক" ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অধিকারকে বর্তমানে আরও "সামাজিক" অর্থাৎ পারস্পরিক ও সম্পর্কীয় হওয়ার ধারায় নিয়ে আসতে হবে; তাতে আসবে "দায়িত্বশীল স্বাধীনতা ও অধিকার"। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলারের কনসেনট্র্যাসন ক্যাম্প পার হয়ে আসা ভিক্টর ফ্রাঙ্কল তাই বলেন যে, ফরাসী-বিপ্লবের স্বাধীনতা চেতনায় নির্মিত আমেরিকার পূর্ব পাড়ে স্থাপিত "স্বাধীনতা মূর্তি"-র ভারসাম্য এনে দেশটির পশ্চিম পাড়ে "দায়িত্ব-মূর্তি" স্থাপন হওয়া প্রয়োজন। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বলে স্বীকৃত মানুষ "শ্রেষ্ঠ জীব" হয় কীভাবে? বর্তমান বিজ্ঞান গবেষণা বলছে যে, অণু-পরমাণু পর্যায়ে মানুষের এবং অন্য ক্ষুদ্রতম প্রাণীরও "ডি-এন-এ"-এর পদার্থ ও রসায়নের মধ্যে খুব বিশেষ পার্থক্য নেই বললেই চলে। তাহলে অন্যান্য জীব ও মানুষে আসল পার্থক্য কীভাবে হয়? শেষ ধাপে মানুষ তার দেহের মৌলিক পদার্থ ও রসায়নের সমন্বয় করে এবং তা তার নিরাকার আত্মার সাথে একাত্ম করে নিয়ে মিলনের সামর্থে আত্মিক ধাপে উন্নীত হয়ে "শ্রেষ্ঠ" জীব হয়। পার্থিব দেহ ও অন্তরসত্তা মিলনে গুছিয়ে একাত্ম হয়ে মানুষ আত্মিক হয়। নিজের মধ্যে এবং অন্যের সাথে সমন্বয় ও মিলনের শ্রেষ্ঠ সামর্থের কারণেই মানুষ বিস্ময়কর সৃষ্টি ।

খ্রিস্টীয় শিক্ষা অনুসারে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর নিজেই মিলনের অনন্তকালীন পূর্ণ সামর্থে ত্রি-ব্যক্তির "মিলন সত্তা" হয়ে শ্রেষ্ঠতম সত্তা; তাঁর সত্তার অনুসরণেই তাঁর সৃষ্টি মানুষ "মিলন সত্তা" হয়ে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আর সেই মিলন ধারার অনুসরণেই ক্ষুদ্রতর পরিমাণ থেকে বৃহত্তর পরিমাণের সৃষ্টির সকল পদার্থ ও প্রাণীর ভিতরের চেহারা ও পরিচয়। তাই বিশ্বজগতে সব কিছুর মধ্যে বিভাজন ও বিভক্তি এবং বিরুদ্ধতা হল অপরিপূর্ণতা, এবং তা আঁকড়ে চলাই পাপময়তা। তা বিলীন করে "মিলনের ধারা" দৃঢ়তরভাবে স্থাপিত করে রাখতে পারলেই সমস্ত সৃষ্টিতে প্রকৃত সভ্যতা অর্জন হয়। *[বাংলা ভাষায় "সভ্য" অর্থ হল একসাথে এসে দীপ্তিমান হওয়া : [স (সহিত) + ভা (দীপ্তি) পাওয়া + য (সংজ্ঞার্থে] সভ্যতা তাই "সামাজিক উৎকর্ষ: সাহিত্য, বিজ্ঞান-দর্শন, সূক্ষ্মশিল্প, শ্রমশিল্প, ধর্ম, নীতি ও বিবিধ বিদ্যার অনুশীলন হেতু হৃদয়-মনের উৎকর্ষ এবং তদানুযায়ী লোকযাত্রা। (বাংলা অভিধান দ্রষ্টব্য)]*

[এ পর্যায়ে এসে বাংলা ভাষার কৃতি (কৃৎ), প্রকৃতি (প্র+কৃৎ) এবং সংস্কৃতি (সং + কৃৎ) কথা তিনটির সামান্য আলোচনা করা যায়। সমস্ত কিছুই করা ও হওয়ার "ক্রিয়া" (কৃৎ), যা দ্বারা কোন কিছু "হয়" ও "আছে"; প্রাথমিক ধাপে এককের ক্রিয়া হল "কৃতি (কৃৎ)", আপনার একক ছোট অবয়বে ক্রিয়া ও সত্তা; তা তার স্ববেশ: তা অন্যের সাথে চলাচলবিহীন "স্থাবর" অবস্থা। দ্বিতীয় ধাপে তা প্রসারিত হয় "প্রকৃতি (প্র+কৃৎ)" ক্রিয়া হয়ে, [প্র (পরিপূর্ণতার) কৃৎ বা ক্রিয়া হয়ে], যে কৃতিতে সত্ত্বা "পারস্পরিক ও সম্পর্কীয়" হওয়ার দ্বারা অনেকের মাঝে চলমান ও "বন্ধু" হয়ে প্রসারিত পরিচয় পায়; তখন স্থাবর অবস্থা উত্তীর্ণ হয়ে সে "চলমান ও জীবন্ত" সত্তা হয়। এমনিভাবে "পারস্পরিক ও সম্পর্কীয়" হওয়ার ক্রিয়া সমস্ত সৃষ্টির এবং আরও পূর্ণভাবে মানবের প্রকৃতি, যার মাধ্যমে সবাই এক অপরের "প্রতিবেশী" হয়, পারিবারিক হয়। সমস্ত প্রকৃতি এই অর্থেই প্রকৃতি বা প্রকৃত সত্তা। তাই, "একা হয় না কেউ, হয় কয়েকে মিলে": তা-ই প্রকৃত হওয়ার ধারা। তৃতীয় ধাপে যখন "পারস্পরিক ও সম্পর্কীয়" হওয়ায় প্রকৃত, তথা পারিবারিক হয়ে কোন কিছু আরও বিস্তারিত পর্যায়ে অনেক প্রকৃত সত্ত্বার সাথে সম্মিলিত হয়, তখন তাদের মিলিত আচরণ, সবার সমন্বিত (সম) কৃতি (কৃৎ) হিসেবে তাদের "সংস্কৃতি" হয়; তাতে তার "পরিবেশ" সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি ঘর স্থাবর একক বিষয়, একটি বাড়ি তার ক্ষুদ্রতম প্রকৃত জীবন্ত রূপ ও প্রতিবেশী, এবং একটি গ্রাম প্রসারিত রূপে তাদের সংস্কৃতি ও পরিবেশ। এই প্রক্রিয়ার মাঝে প্রকৃত জীবন্ত চলমান বিষয়, যা বায়ে সংকীর্ণ স্থাবর প্রকাশ, আর ডানে প্রসারিত সর্বজনীন প্রকাশ হয়। তাই, মানুষ পরিবারে আসল মানব প্রকৃতি, প্রকৃত সত্তা; বায়ে নিজে একক স্থাবর অহম একজন, এবং ডানে সবার সাথে মিলে সভ্যতার বিষয় হয়।]

মানুষ ঐ মিলন ও সমন্বয়নের ধাপে অধিক বলবান হয়ে অধিক "শ্রেষ্ঠ জীব" হয়; এই ধাপে তাকে আরও কতদূর যেতে হবে তা তার বহু যুগের করণীয় বিষয়; তা-ই ধর্ম, যা এনে দেয় অন্তরে-বাহিরে অপবিভাজন ও বিভক্তির বিরুদ্ধতার পাপময়তা হতে মুক্তি। "হোক তোমার প্রশংসা" পত্রটি পৃথিবীর বুকে সেই রূপ সব কিছুর সমন্বিত হওয়ার সভ্যতার কথা বলছে। পৃথিবী আমাদের "সর্বসাধারণের আবাস-গৃহ", কেননা এখানে সবাই সবার আশেপাশে ও হৃদয়ে গৃহীত, এবং গৃহীত হয়ে যেন থাকে। তা মর্তলোকের স্বর্গলোক পরিচয়! (চলবে)

মহামারী নোভেল করোনাভাইরাসে আমাদের পিছুটান ও পিছিয়ে পড়া

ফাদার রবার্ট গনসালভেছ

পাহাড়ী তৃণমূলে বসবাস। সময় ও সঙ্কটে নির্মম পরিহাস হেতু ছিন্নমূল ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পাহাড়ী উপজাতি। আদিবাসী জনগণ পিছিয়ে পড়া বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত প্রতিকারবিহীন তীব্র সমস্যা-সংকুল জাতিসত্ত্বা। পাহাড়েই জীবনগাঁথা ও দীর্ঘকালে উঁচু-উঁচু পাহাড়ের বনভূমিতে জীবন-যাপন। এ দূর্গম পাহাড়ে আঁকা-বাঁকা, উঁচু-নিচু ঝোঁপ-ঝাড়ের পথ তদুপরি পাহাড়ের পাদদেশে ছড়া, ঝিরির পানি, পাথুরে পথে চলতে অভ্যস্ত আদিবাসী পাহাড়ী। এখানে একদা ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের দিকে কাপ্তাই নদীতে বাঁধ থেকে সৃষ্ট তীব্র স্রোতে উপচে পড়া পানির ঢলে কাপ্তাই, বিলাইছড়ি ও রাঙ্গামাটির তবলছড়ি বালুখালী, মরিচাবিল এলাকায় পাহাড়ী আদিবাসী বসতি ও ঐতিহ্যবাহী রাজবাড়ী সবই সর্বশান্ত হয়ে পানির তলদেশে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছে। আচমকা পানির তাণ্ডব ও প্রচণ্ড ঝাঁপটায় দিক-বিদিক শূন্য হয়ে ভাসমান ও ছিন্নমূল কাপ্তাই ও কর্ণফুলী নদী এলাকার সীমানায় বসবাসরত পাহাড়ী জনগোষ্ঠী স্থবির ও বিরানভূমি থেকে মুহূর্তের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে পানির তলায় চলে যায়। কাপ্তাই হাইড্রোইলেট্রিক প্রজেক্ট থেকে সৃষ্ট বন্যায় পাহাড়ি নৃ-গোষ্ঠী নতুন জায়গার সন্ধানে এক বস্ত্রে পার্শ্ববর্তী খাগড়াছড়ি জেলায় দীঘিনালা, তুলাবান, ঝগড়াবিল, মারিশ্যা, পানছড়ি, কুকিছড়া, জোরমরম ও গাছবানসহ বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে নতুন করে বসতি স্থাপন করে।

অসহায় ও কষ্টে সৃষ্ট পাহাড়ী জীবনে অমানিশা নেমে আসে পার্বত্য শান্তিচুক্তির এ সময়ে। যখন শান্তিবাহিনী ও সেনাবাহিনী আশির দশকে মরিয়া লড়াই। যুদ্ধ সংঘর্ষ চলছে সে সময়। অত্যাচার, নির্যাতন, শোষণ নিষ্পেষণের বেড়াজালে ও গোলক ধাঁধাঁয় পিষ্ট হয়ে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে পাহাড়ী উপজাতি ভিটা-বাড়ি হতে উচ্ছেদ হয়ে রিজার্ভপাড়া নামে সেনাবাহিনী নিরাপত্তার আওতায় বসতি শুরু করে। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ খাগড়াছড়ি পেরাছড়া ও স্ব-নির্ভর এলাকায় স্টেডিয়ামে শান্তিচুক্তি প্রতিষ্ঠার পর কঠিন জীবন বিনাশী অবস্থার সাময়িক সমাধান ও সমঝোতার সৃষ্ট হয়। অথচ এরই মধ্যে পাহাড়ী ও বাঙালি সেটেলার্সদের বৈরি সম্পর্কে সৃষ্ট সমস্যার কারণে বিভিন্ন স্থানে আগুন, সন্ত্রাস, গোলা-বারুদের বিধ্বংসী বিষ্ফোরনজনিত প্রাণহানি, অত্যাচার-নির্যাতন নিপীড়ন ও বৈষম্যের শিকার হয়ে পাহাড়ী জমি জোরপূর্বক অন্যায়ভাবে দখল, নির্দয় ধর-পাকড় ও মোবাইল নেটওয়ার্ক না দিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে পাহাড়ীদের নিদারুণ কষ্ট ও অভাব-অনটনের শিকার হতে হয়েছিলো। বর্তমান বাস্তবতায় নিরুপায় হয়ে সংখ্যালঘু পাহাড়ী জনগণ নতুন নেতৃত্ব রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন নেতৃত্বের নির্দেশনায় ভূমি অধিকার, সংরক্ষণ ও সুরক্ষার কাজ শুরু করেন। প্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবহার করে

ঐতিহ্য, ভাষা, কৃষ্টি, ধর্ম, আচার-আচারণ সব কিছুর মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ গড়ে তোলা দায়িত্বশীল কর্মকাণ্ড শুরু করে। এতদিন রোগব্যাধির সাথে লড়াই করে জীবন-যাপনে অভ্যস্ত পাহাড়ী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড নানাবিধ চর্মরোগ সহ সর্দি, জ্বর, হাঁচি-কাশির সাথে পরিচিত ছিল। হঠাৎ জীবনের গতি, প্রকৃতি ছন্দপতন করে এ বছর ৮ মার্চ থেকে নোভেল করোনাভাইরাস নামক মরণ ভাইরাসে সংক্রমণের অদম্য শক্তি নিয়ে বর্হিবিশ্ব হতে দরিদ্রতা নিষ্পেষণের শিকার প্রান্তিক জনগণের দ্বারপ্রান্তে এসে বাংলাদেশের সর্বত্র হানা দিয়েছে। মারাত্মক জীবন বিধ্বংসী প্রাণঘাতী নোভেল করোনাভাইরাস সংক্রমণের প্রাদূর্ভাব ছড়ানোর সাম্প্রতিককালে পাহাড়ী জনগোষ্ঠী আতঙ্ক, ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে প্রাণভয়ে ঘরে থাকুন, নিরাপদে থাকুন, পরামর্শ দেহ, মন, হৃদয়-আত্মায় গ্রহণ করে গৃহে অন্তরীণ জীবন-যাপন এ যাবত প্রায় ৫ মাস অতিক্রান্ত হতে চলেছে।

বিরূপ প্রতিকূলতা, বিভিন্ন স্বার্থ, দ্বন্দ্ব, প্রতিবন্ধকতা ও পাহাড়ী-বাঙালি ক্ষমতা টিকে থাকার প্রতিবন্ধকতার কোন প্রতিকার বা প্রতিবিধানের পথ ও উপায় না থাকায় এমতাবস্তায় মরার উপর খাঁড়ার ঘা। প্রাণান্তকর অবস্থায় সুদূর চীনের উহান হতে উত্থিত মরণঘাতী প্রতিষেধকবিহীন মহামারী জনিত দীর্ঘস্থায়ী প্রকোপ পাহাড়ী বিস্তৃর্ণ জনপথকে ধোঁয়াটে ও অনিশ্চয়তায় অমানিশায় ঠেলে দিয়ে পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর মনোবলে আঘাত হেনেছে। সাধারণত প্রকৃতির এ ঋতুতে পাহাড়ী জুম চাষাবাদে অভ্যস্ত জুমচাষী, কৃষকেরা তাদের বসতি হতে নিকটতম পাহাড়-জঙ্গলে আগুন ধরিয়ে দিয়ে চাষযোগ্য পাহাড় পুড়িয়ে পাহাড়-ভূমি প্রস্তুত করে জুমের নানা প্রকার ধান রোপণ করে। জুমের ক্ষেতের পাশাপাশি আদা, হলুদ, লাউ, কুমড়া, বরবটি, ঝিংগা, করলা, মারফা, ভুট্টা, কচুশাক, লালশাক, ডেংগিশাক, পুঁইশাকসহ নানাবিধ পাহাড়ী মরিচ ও সবজি চাষাবাদ করে থাকে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে এদিনে পাকা বোরো ধান কাটা, মাড়াই, ছাটায় ও ঘরে তোলার কাজ এবং অপরদিকে একই সময়ে জুমচাষে পাহাড়ী জমিতে চুরিধান, সোনামুখিধান, চরইধান, গেলংধান, কোম্পানীধান, মধুমালতিধান, ককবরকধান ও কুলমাদামধান ইত্যাদি রকমারিক ভালো ফলনশীল ধান রোপণ কাজে পাহাড়ী নারী-পুরুষ অবিরাম সকাল-সন্ধ্যা কৃষিকাজে নিয়োজিত থাকে। এখন পাহাড় এলাকায় বিভিন্ন কৃষি খামারে ও বাগানে আম, কাঁঠাল, আনারস, লিচু, তেঁতুল, জামম্বুরা, লেবুর ভরা মৌসুম চলছে। যেখানে ক্লান্তি ও বিরামহীন নিশ্বাস ফেলার সময় নেই সেখানে হঠাৎ এ কাজের ব্যস্ততার সময় বজ্রপাতের মত হঠাৎ প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশিকায় মেনে চলার স্বাস্থ্যবিধি এসেছে। তার মধ্যে

লকডাউন, হোম কোয়ারেন্টাইন, আইশোলেশন, ভেন্টিলেশন, সার্জিক্যাল মাস্ক, ব্যক্তিগত সুরক্ষা পোশাক পরিধান, ঘন-ঘন সাবান ও লোশন দিয়ে হাত ধোয়াসহ হ্যাণ্ড স্যানিটাইজার ব্যবহারের স্বাস্থ্যসম্মত পরীক্ষিত স্বাস্থ্যবিধি বিধান মেনে চলার কঠিন বাস্তবতার আওতায় খাগড়াছড়ির দূর্গম এলাকার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পাহাড়ে জনপদে সবার কাছে ভয়-আতঙ্ক নয় সচেতন হওয়ায় বার্তা ইতোমধ্যে পৌঁছে গেছে। ফলত স্পর্শকাতর এ নিদারুণ সঙ্কট সৃষ্টি দুঃসংবাদে থমকে গেছে স্বাভাবিক প্রাত্যহিক কাজকর্ম ও পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর চলাফেরা ও হাঁটে-বাজারে পদচারণা শাক-সবজি বহন এবং বটতলার বাজারে, তেঁতুলতলার বাজারে, মধুপুর বাজারে টাটকা ও সদ্য পাহাড় থেকে তুলে আনা বেঁচা-কেনার বৈচিত্র্য। অনগ্রসর অবহেলিত জীবন-যাত্রায় পিছিয়ে পড়ায় পাহাড়ী নৃ-গোষ্ঠী চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা জনসাধারণ স্বভাবজাতভাবে উঁচু পাহাড়ী এলাকায় বসতি স্থাপন করে আত্মীয়তার যোগবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বাঁশ-বেত-ছনের ঘর ও মাটির ঘর তৈরি করে একই জাতিসত্ত্বায় দলগত ও সমাজগত হয়ে বসবাস করে। প্রতিদিন সকালে পাহাড়ী নারী-পুরুষ কৃষিকাজ সম্পর্কিত জুম চাষ, রোপণ, আগাছা পরিষ্কার, নিড়ানীসহ বিভিন্ন আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালনে দা, কাঁচি, কুড়াল, খোন্তা, কোদাল অপরদিকে কাল্লাং, বারেং ও কারাং নিয়ে চাষাবাদে ঘাম ঝরানো কঠিন কাজে জড়িয়ে পড়ে। গত এক বছরে বেতছড়ি খ্রিস্টান চাকমা এলাকায় আমার পালকীয় কাজের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় তাদের চলাফেরা জীবন-যাপন ও নিত্য জুম এলাকায় শ্রম সাধনায় বাহারী সবজি উৎপাদনে কষ্ট ও আনন্দের জীবন দেখেছি। এখানে সাজেক পাড়া, কুলি পাড়া ও ইটছড়ির চাকমা বসতির নিকটতম জুমচাষ এলাকার মধ্যে দাঁতভাঙ্গা ছরা, পানকদাছরা, সামুদিছরা, জগনাগাছছরা, মাখনাছরার মত উঁচু পাহাড়ী বনভূমিতে জুমচাষ করে নানাবিধ শস্য ফলন ও পাশাপাশি জুমের বাঁশ কোরল, জংলী আলু, পলা আলু, গুটি আলু, খাতরা আলু ও সীমের আলু, অন্যদিকে জারা ওলকচু তাদের প্রিয় খাবার যা প্রকৃতির মধ্যে সচরাচর দেখা যায়। এছাড়া মাশরুম জাতীয় গুল্ম উদ্ভিদ মারমা ভাষায় তংবুমহন, ওরাংমো ছেংসেমো, ক্রোহ্লামো ও নিখিমো বিভিন্ন প্রকারের মাশরুম পাহাড় জংঙ্গলে পাওয়া যায়, যা পাহাড়ীদের খুবই প্রিয় ও সুস্বাদু খাবার। অপরদিকে পাহাড় উপত্যকার ঝিরি ও ছরাতে পুঁটি মাছ, চিংড়ি, কাকড়া গুতুমমাছ, পেনুন পাতা মাছ, চোখ বাগা মাছ, পোনা ব্যাঙ, কুরকুরি ব্যাঙ, কোয়া ব্যাঙ, বৈগনা, পেলাও, কোয়া শামুক, বড় গোল আকৃতির শামুক, কুইচা ইত্যাদি পাওয়া যায়। এছাড়া শুটকি ও নাপ্পি দিয়ে রান্না ভর্তা, গুতানি ও আপ্রাইন এদের প্রিয় খাবার।

অপ্রতিরোধ্য ভয়ঙ্কর ছোঁয়াচে ব্যাধি করোনাভাইরাস পাহাড়ী সংস্পর্শে এসে ইতোমধ্যে হানা দিয়েছে। এ কঠিন দুর্ভোগকালে মুহূর্তের মধ্যে দুর্ভাগ্যজনিত সংবাদ সবার কাছে জানাজানি হয়ে যাচ্ছে। সহজ, সরল, অল্পতেই শঙ্কিত, কাতর ও খেটে খাওয়া দিনাতিপাত করে যাওয়া পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর ওপর সর্তক দৃষ্টি আরোপ করার জন্য কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপের ফলে ভয়ে, শঙ্কায় ও আতঙ্কে পিছিয়ে পড়া হতে পিছুটান প্রকাশে অনুমতি হচ্ছে ও উপলব্ধি করা যাচ্ছে। বর্তমানে প্রশাসনিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিধি-নিষেধের কারণে মুক্ত চলাফেরায় ভাটা পড়েছে। এখানে প্রচার পত্রিকায়, মাইকিং ও মোবাইল রিংটোনে বলা হচ্ছে সুস্থ ও নিরাপদ থাকার একমাত্র উপায় হলো ঘরে থাকা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলা এবং একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত ঘরে নিরাপদে থাকার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। তবে খানিকটা আশার বাণী শোনা যাচ্ছে ও খবরে প্রকাশ এন্টিভাইরাল ঔষুধ রেমডেসিভির (Remdesivir Antiviral Drug) সম্প্রতি কোভিড-১৯ চিকিৎসায় যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ঔষুধ নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থায় (এফডিএ) জরুরী ব্যবহার প্রতিষেধক হিসেবে অনুমোদন পেয়েছে। বাংলাদেশের ঔষুধ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী বেক্সিমকো ফার্মা কোভিড-১৯ চিকিৎসায় সরকারি হাসপাতালে গুরুতর অসুস্থ রোগীদের জন্য রেমডেসিভির প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

স্পর্শকাতর এসময়ে করোনা মাইক্রোসফট এন্টারপ্রাইজ সফটওয়ারের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। পূর্বে শুনেছি যারা উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত তারা সোশ্যাল ডিসটেনস্ বজায় রেখে কর্মস্থলে ভাবগাম্ভীর্য বজায় রেখে সম্মান, ক্ষমতা, পেশাগত দক্ষতা, অর্জন করে দূরত্ব নিয়ে জীবন চলতো। বর্তমানে নভেল করোনা সংক্রমণে সোশ্যাল ডিসটেনস্ এর কথা বলা হচ্ছে। উদ্ভাবন ও ব্যবসা বাণিজ্যের উদীয়মান অনুশীলন আচরণবিধি অনুযায়ী ৬ফিট দূরত্ব থাকা, পরিবারের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রাখা ও ভাইরাস হতে মুক্ত থাকা। শহরবাসী ডিজিটাল ও অনলাইনের বাতাবরনে ঘরে থেকে ম্যাসেজ ও ভিডিও কনফারেন্স, অনলাইন খ্রিস্টযাগ, রোজারিমালা প্রার্থনা, রন্ধনশালায় রকমারী রান্নার স্বচিত্র প্রকাশ, ঘরে বসে কণ্ঠশিল্পীদের নবজাগরণ, শিশুদের নাচ, কবিতা আবৃত্তি, উৎপাদন ও সরবরাহ অটোমেশন প্রক্রিয়া ইত্যাদি ফেসবুক অনলাইনে সবাই উপভোগ করছে।

মর্মস্পর্শী এ দুঃখ-যন্ত্রণায় এবং অজানা যাত্রায় আপদকালীন সময়ে অদৃশ্য জীবাণু নোভেল করোনাভাইরাস বেকারত্ব, অর্ধহারে, অনাহারে অর্থ সঙ্কটে দিন-দিন বাড়িয়ে তুলে পরিস্থিতি তীব্র ও মহাসঙ্কটে পতিত হচ্ছে। পাহাড়ীরা নিতান্তই দুঃখ-কষ্টে নিমজ্জিত থাকলেও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করে ঘরে থাকে। সামাজিক সম্পর্ক টানাপোড়েন নয় বরং সুন্দর ও দৃঢ়তর সম্পর্ক আপন ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে অল্প পরিসরে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও অজপাড়া গাঁয়ে নবান্ন উৎসবসহ ভিন্নি পিঠা, সাইন্না পিঠা, বড়া পিঠা, ধুপি/ভাপা পিঠা, কলা পিঠা, মারি পিঠা, চিতই পিঠা, গোরাম পিঠা ও ছুম পিঠা তৈরি করে সামান্য আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। এদিকে আপারপেরাছরা কাথলিক মিশনের প্রকৃতি ও পরিবেশ পাহাড় বনভূমি ছরা ও ধানক্ষেতসহ অনাবিল মাধুর্য ও সৌন্দর্যে বিস্তৃর্ণ এলাকা। এখানে মগ/মার্মা পাড়ায় এ মৌসুমে নানা ধরনের পিঠা প্রচলন রয়েছে। তার মধ্যে কর্দামু, খপমু, ছেসমমু, চিসিমু, কেংদকমু, ফ্যকামু সহ রকমারি পিঠা বানিয়ে ঝিমিয়ে পড়া জীবনকে ঝকঝকে-তকতকে রাখার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। প্রাণঘাতী নোভেল করোনাভাইরাসের অদৃশ্য জীবাণুর শক্তির সাথে বসবাসের তীব্র আঘাতে পাহাড়ী জনগোষ্ঠী পরিত্রাণ পেতে ইদানিং ধর্মীয় জীবন-যাপনে আরো তৎপর ও আন্তরিকভাবে গভীর ধ্যান সাধনায় প্রার্থনা করছে। আমার কাছে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো এখানে পাহাড়ী সমাজ ধর্ম বিশ্বাসে, ভক্তি-শ্রদ্ধায় ও সৃষ্টিকর্তা মহাপরাক্রমশীল ঈশ্বর ভালোবাসায় একনিষ্ঠ হয়ে পূজার অর্ঘঢালা সাজিয়ে মন্দিরে উৎসর্গ করার নিমিত্তে ধর্মগুরু ভান্তের আশীর্বাদ যাচ্না করছে। করোনাভাইরাস হতে নিরাপদে থাকা ও সুস্থ থাকার মানসে মন্দির থেকে পবিত্র জল নিয়ে এসে নিরাময়ে অতুগ্র বাসনায় সিক্ত হয়ে নিজ-নিজ ঘরে এবং পবিত্র আসনে পবিত্র জল ছিটিয়ে দিয়ে সুস্থ, শুচিতা ও পবিত্রতার জন্য সযত্নে, স্বস্নেহে ভক্তি ভালোবাসায় ও বিনম্রতায় সিক্ত হয়ে মোমবাতি প্রজ্বলন ও ধুপারতি করে প্রার্থনা করছে। অজানা রহস্যবৃত মহামারী করোনাভাইরাস হতে মুক্তি ও স্বাধীন জীবনযাত্রা সামনের দিকে এগিয়ে চলার মনোবাসনায় আমরা স্থানীয় যাজকগণ ও সিস্টারগণ মা মারীয়ার জপমালা প্রার্থনা, সাক্রামেন্তিয় আরাধনা, খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ ও বৈশ্বিক নোভেল করোনাভাইরাস সংক্রমণ হতে নিরাময়ের প্রার্থনা কার্ড ব্যবহার করে সবার নিরাময়ের জন্য প্রার্থনা করে যাচ্ছি। সবার প্রতি সবিনয় আহ্বান-সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন এবং ঘরে থাকুন॥ ❑

খ্রিস্টীয় পরিবারে কথা বলা ও শোনার গুরুত্ব

ড. লিপি গ্লোরিয়া রোজারিও ও জেমস্ শিমন দাস

"তোমাদের মুখ থেকে যেন কখনো কোন খারাপ কথাবার্তা না বেরোয়; বরং মানুষের যা ভাল করতে পারে, প্রয়োজন মতো গঠনমূলক কোন-কিছু করতে পারে, তোমরা তেমন কথাই বলো, যাতে, যারা শুনছে তাদের কোন উপকার হয়।" - *(এফেসীয় ৪:২৯)*।

জগতের অতি সাধারণ নিয়মে যখন আমরা প্রিয়জনের কাছ থেকে কোন উপহার পেয়ে থাকি, তখন সেটিকে আমরা অতি যত্নের সাথে ব্যবহার ও সংরক্ষণ করি। যদি কখনো মেরামতের প্রয়োজন হয় সেটি অত্যন্ত সচেতনভাবে করে থাকি, যাতে করে সেটি পূর্বের ন্যায় অবিকল থাকে। আর উপহারটিকে যদি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণে সকলের সামনে নিয়ে আসতে না পারি *(প্রিয়জনের পত্র)* তখন সেটিকে অতি গোপন ও নিরাপদ স্থানে রাখি এবং প্রায়ই সেটিকে একাকী দেখি ও উপভোগ করি। কখনোবা আবার সেটিকে (সনদ, স্মারকপত্র, মানপত্র, বিশেষ ব্যাজ/স্টিকার/লোগো) সকলের জন্য উন্মুক্ত প্রদর্শন ও ব্যবহার করি এবং সেটি করে সম্মানিত ও গর্ববোধ করি। আর উপহার নিয়ে পবিত্র বাইবেল বলে, একজন সন্তান একটি পরিবারে প্রেমময় সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরপ্রদত্ত উপহারস্বরূপ *(সামসঙ্গীত ১২৭:৩ পদ)*। আপনি মহান সদাপ্রভু প্রদত্ত এই পুরষ্কারের কেমন ব্যবহার করছেন? আপনি কি আপনার সন্তানের ব্যাপারে যত্নশীল ও সচেতন? আপনি কি আপনার সন্তানের জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করছেন অথবা আপনি কি নিজেই আপনার সন্তানের জন্য নিরাপদ? আপনি কি আপনার সন্তানের জন্য সকলের সামনে সম্মানিত ও গর্ববোধ করতে পারেন? এসকল প্রশ্নের অকৃত্রিম উত্তর খোঁজার উত্তম সময় এখনই। কারণ আপনার প্রশ্নের সদুত্তর ও পদক্ষেপই আমাদের সমাজ ও জাতির ভবিষ্যৎ তরুণ-যুবাদের আগামীদিনের চলার পথকে সুগম করবে। এই প্রবন্ধে আমরা আমাদের দেশের তরুণ-যুবাদের আত্মহত্যা প্রতিরোধে করণীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

যে কোন দেশের ভবিষ্যৎ সে দেশের যুব সমাজ ও তরুণদের নতুন সঞ্জীবনী, নতুন নতুন উদ্যোগ-উদ্যোম, উদ্ভাবনী কলা-কৌশল, আবিষ্কার ও প্রাণচঞ্চলতার উপর নির্ভর করে। তরুণদের মধ্যে থাকবে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়ার সাহস, থাকবে না পরাজয়ের ভয়, থাকবে শুধু প্রাণ-সঞ্চারিণী জীবনি শক্তি এবং নিত্য নতুন জানার ও আবিষ্কারের অদম্য স্পৃহা। এটি যেমন আমাদের বাংলাদেশের খ্রিস্ট মণ্ডলী তেমনি বিশ্ব মণ্ডলীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু অতি সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও পত্রিকায় এসব অপার প্রাণশক্তিতে ভরপুর তরুণ-যুবার আত্মহত্যার সংবাদ আমাদের জন্য একটি অশনি সংকেত ও অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। এসব তরুণ মেধাবীদের আত্মহত্যার বহুবিধ কারণ বিদ্যমান এবং এটি নিয়ে বিশদ আলোচনা করা যায়। তবে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা না করে কিভাবে আত্মহত্যা প্রতিরোধ করা যায় সেসবের মধ্যে সুনির্দিষ্ট একটি বিষয়ে আলোকপাত করবো।

একটি গবেষণায় দেখা গেছে আত্মহত্যাকারী দশজন ব্যক্তির মধ্যে আটজন তাদের আত্মহত্যা প্রবণতা বা ইচ্ছা নিয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষণ প্রদর্শন করে থাকেন। গত কয়েকটি আত্মহত্যার ঘটনায় আমরা দেখেছি যে, আত্মহত্যাকারী ব্যক্তিগণ তাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাদের আত্মহত্যার পূর্বে এ সম্পর্কিত বিভিন্ন পোস্ট দিয়েছেন। যেমন: "আমার মৃত্যুর পর পরিচিত সকলের কাছে আমার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছিয়ে দিও, মাঝে-মাঝে মনে হয় যেন মরে যাওয়াই অনেক সহজ, সিলিংয়ে ঝুলে গেল সত্তা, নাম দিল তার আত্মহত্যা, What a dream of your life was! I have to finish it all myself today. God why did you do that? I had a great desire to live!" এগুলো তাদের মৃত্যুর পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে এবং পরিবারসহ কাছের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব এইজন্য অনুশোচনা করছেন..."ইস্, যদি আমি আর একটু আগে বুঝতে পারতাম!" স্মরণে রাখবেন, আত্মহত্যাপ্রবণ ব্যক্তি এইভাবে সবার কাছেই তার নিজের কষ্টের কথা, অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়ার বিষয়টি তুলে ধরে। আত্মহত্যাপ্রবণ ব্যক্তি কখনোই আত্মহত্যা করতে চান না বরং আত্মহত্যার চিন্তায় ভোগা অধিকাংশ ব্যক্তিই আত্মহত্যা নিয়ে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন এবং আত্মহত্যার চেষ্টা করার আগে নিজের অনুভূতি অন্যদের কাছে প্রকাশ করেন। এ অনুভূতি প্রকাশের আড়ালে থাকে সাহায্যের প্রার্থনা। যদি সে প্রার্থনা কোনোভাবে বোঝা এবং উপযুক্ত সাহায্য করা যায় যায়, তাহলে সে যাত্রায় বেঁচে যেতে পারে একটি তাজা প্রাণ ও থেমে যেতে পারে হাজার মানুষের কান্নার রোল-আহাজারি। এখন আমরা কিভাবে আত্মহত্যাপ্রবণ ব্যক্তিকে সাহায্য করতে পারি সে সম্বন্ধে আলোচনা করব।

আত্মহত্যাপ্রবণ ব্যক্তিকে সাহায্য করার সবচেয়ে কার্যকর, সহজ ও উত্তম উপায় তার কথা সহমর্মিতার সাথে শোনা। এই ধরনের পরিবারের প্রতিটি সদস্য ও ঘনিষ্ঠজনদের এটি পবিত্র দায়িত্ব যেন আপনি ঈশ্বরের পবিত্র জীবন্ত মন্দিরের এই ক্ষুদ্র অংশকে গঠন ও বৃদ্ধিতে সাহায্য করেন *(১ করিন্থীয় ১২:৭ পদ)*। স্মরণ করুন পৃথিবীর প্রথম খুনের ইতিহাস। যখন কাইন তার ভাই আবেলকে হত্যা করে পালানোর পরিকল্পনা করছিলেন আর ঠিক তখনই ঈশ্বর কাইনকে জিজ্ঞেস করলেন,"কাইন, তোমার ভাই আবেল কোথায়?" কাইন বললেন, "জানি না, আমি কি আমার ভাইয়ের রক্ষক *(আদিপুস্তক ৪:৯ পদ)*?" একথা শোনার পরপরই ঈশ্বর কাইনকে অভিশাপ দিলেন। হয়তোবা আপনার এই দায়িত্বের অবহেলার দরুণ কাইনের মত ঈশ্বর আপনাকেও জিজ্ঞেস করতে পারে, "টমাস, তোমার বোন ক্রিষ্টিনা কোথায়?" তখন আপনি কি উত্তর দিবেন? অন্যদিকে আপনি শুধুমাত্র তার কথা মনোযোগ ও সহমর্মিতার সাথে শোনার মাধ্যমে তাকে এই পৃথিবীতে বাঁচার ও আশার আলো দেখাতে পারেন। নিরপেক্ষতা বজায় রেখে সহমর্মিতার সাথে সক্রিয়ভাবে কথা শোনার জন্য আপনি নিচের কাজগুলো করতে পারেন।

- তার সাথে কথা বলার সময় তার প্রতি দৃষ্টি দিন। গলার স্বর নরম রাখুন এবং সকল প্রকার কাজ যেমন: মোবাইলে কথা বলা, গান শোনা, ফেসবুক স্ক্রলিং করা, টেলিভিশন দেখা, বই পড়া ইত্যাদি থেকে বিরত থাকুন।

৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)

শান্তিতে থাকার ইচ্ছা

পিটার প্রভঞ্জন কারিকর

আমরা কেউ-কেউ অনেক সময় কোন নিরাপদ জায়গায় আত্মগোপন করে জীবনের দুঃখ-কষ্ট, শোক-তাপ, বেদনা ও ক্রোধকে ভুলে থেকে শান্তি পেতে চেষ্টা করে থাকি। কিন্তু এ ধরনের শান্তি ক্ষণকালের। দীর্ঘক্ষণের বা স্থায়ী শান্তির আশ্রয়স্থল হলেন আমাদের ত্রাণকর্তা প্রভু যিশু খ্রিস্ট। 'তোমাদের জন্য শান্তি রেখে যাচ্ছি, আমারই শান্তি তোমাদের দান করছি- জগৎ যেভাবে তা দিয়ে থাকে, আমি সেভাবে তা তোমাদের দান করি না। তোমাদের হৃদয় যেন কম্পিত না হয়, যেন ভীত না হয়।' *(যোহন ১৪:২৭)*

জগতের শান্তি মিথ্যা, ক্ষণস্থায়ী, বেশিদিন থাকে না। প্রভু যিশু যে শান্তি দিয়েছেন তাই চিরকালীন। কেননা প্রভু যিশু মানুষের ও ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের জন্যই পৃথিবীতে এসেছিলেন।

জীবনে কখনো-কখনো একা থাকার অভ্যাস রপ্ত করতে হয়। কারণ সবচেয়ে খারাপ মুহূর্তগুলো একাই কাটাতে হয়। একা কাটাতে চাইলে আমাদের কিছু ভাল অভ্যাস, যোগ্যতা এবং শিক্ষার প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন একটা শিক্ষিত মনের। বুনোমনাদের মানসিক শক্তি ও শান্তি নেই। ভাল অভ্যাসের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস, বাইবেলের বাণী আসক্তি, মিষ্টি সঙ্গীত শোনা, গান-বাজনা চর্চা করা, আবৃত্তি করা, লেখা-লেখির সাথে যুক্ত থাকা, লাইব্রেরিতে যাওয়ার অভ্যাস, জ্ঞানকে ভালবাসা এবং চর্চা করা ইত্যাদি। এ ধরনের সুন্দর অভ্যাসগুলি আমাদের মনকে প্রফুল্ল রাখতে যাদুর মত কাজ করে। মানুষের ক্ষুদ্রতাগুলিকে হজম ও বহন করতে শেখা এবং তার ভাল গুণগুলিকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি তৈরী করা। মনের মধ্যে এলোমেলো বাজে চিন্তাগুলি তাড়ানোর মানসিক শক্তি অর্জন করা। প্রতিদিনকার দুঃখ-বেদনা এবং উথাল-পাতাল আবেগ, চিন্তা-ভাবনা ও ঘটনাগুলি যা আমাদের সহজেই ধরাশায়ী করতে পারে ; এই সমস্ত ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণের শক্তি এবং নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ও অভ্যাস গঠন গুরুত্বপূর্ণ। আত্মনিয়ন্ত্রণ বা আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা একটা নিরন্তর প্রচেষ্টা হতে পারে। নিজের অনিয়ন্ত্রিত মন এবং আবেগ নিজের ধ্বংস বা পতনে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। নিয়মিত হালকা ব্যায়াম, প্রতিদিন ভাল বই এর কিছু অংশ পাঠ করা, সময় পেলে ছোট শিশুদের সাথে দুষ্টমি করা ইত্যাদি প্রচেষ্টার মাধ্যমে জীবনের কঠিন চাপকে হালকা করা যেতে পারে। বাইবেল থেকে কিছু অংশ পাঠ এবং ধ্যান ঔষধের মত কাজ করে। যখন আমরা দুঃখ-কষ্ট ও নিদারুণ মানসিক চাপের মধ্যে থাকি তখনও যদি প্রভুর প্রতি স্থির, নির্ভরশীল ও বিশ্বস্ত থাকি, ঈশ্বর তখন তাদের পূর্ণ শান্তিতে রাখেন। বিশ্বাস এবং বিশ্বাসের চর্চা করে দেখলেই হাতে-নাতে তার ফল পাওয়া যেতে পারে। কেননা ঈশ্বর শান্তি রচনাকারী। তাঁর বাণী ধ্যান করলে শান্তি আমাদের মনের মধ্যে নদীর মত প্রবাহিত হতে থাকবে। তখন অশান্তির স্রোত আমাদের জীবনের প্রশান্তির স্রোতকে বাঁধাগ্রস্ত করতে পারে না। বরং তা আরো বেগবান হয়ে ওঠে। হৃদয়-মনে এক ধরনের আনন্দের ঝাঁকুনী আসে এবং গুনগুনিয়ে শান্তি সঙ্গীত বাজতে থাকে। আমাদের মনের রাজ্যটা বিশাল কিছু। শান্তির ললিতকলায় পূর্ণ। শুধু জানতে হয় কিভাবে এর চাষ করতে হয়। শস্যের যোগানদাতা প্রতাপশালী ঈশ্বর। *যিশাইয় ৪৮:২২ এবং ৫৭:২১ পদানুসারে দুষ্ট লোকদের কোন কিছুই শান্তি নাই।* আমাদের সমাজে বিশেষভাবে খ্রিস্টমণ্ডলীতে এ জাতীয় দুষ্ট লোকের অভাব নাই। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় দুষ্টতা প্রদর্শন করতে না পারলে যেন তাদের বাহাদুরী বজায় থাকে না। ঈশ্বর মানুষের বিবেককে এমনভাবে গঠন করেছেন যে, যারা দুষ্টতাপূর্ণ জীবন-যাপন করে, তাদের মনে কখনও খাঁটি শান্তি আসে না। তারা যতদিন পাপপূর্ণ আচরণ ও পাপক্রিয়া করতে থাকবে, ততদিন তাদের জীবনটা হবে অশান্ত সমুদ্রের মত উত্তাল ও কর্দমাক্ত। ঈশ্বর এইরকম লোকদের পছন্দ না করলেও সব সময় প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন যেন তারা অনুতপ্ত হয়ে পরিত্রাণ লাভ করে।

আমরা এক একজন শান্তির বার্তাবাহক হয়ে উঠতে পারি। শান্তির উৎসের খোঁজ করে জ্ঞান অর্জন করা জরুরী। অন্তরের জটিলতা-কুটিলতা ত্যাগ করতে না পারলে সে কখনো শান্তির উৎসের সন্ধান পাবে না। ঈশ্বরের উপরে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে তাঁর ইচ্ছাকে হৃদয়ে উপলব্ধির বাসনা জাগ্রত রাখতে প্রাণপণ করতে থাকলে একসময় আমরা শান্তির শিল্পী হয়ে ওঠতে পারি। এক্ষেত্রে শান্তির তাগিদটা আমাদের মধ্যে প্রোথিত করার প্রবল ইচ্ছাকে লালন করে যেতে হবে। কেননা শান্তিতে থাকা এবং শান্তি স্থাপনের প্রত্যাশা মনের মধ্যে রাখতে না পারলে কথার ফুলঝুরি ফুটিয়ে কিছুই হয় না। হৃদয় মাঝের আশাই আমাদের সামনে চলার পথ তৈরি করে দেয়। শান্তি স্থাপনের আবেদন হৃদয় ঘটিত হতে হবে এবং একে উপেক্ষা করলে আমরা ঝমঝমকারী করতাল বলে আখ্যায়িত হবো। আমাদের মনে স্থান দেওয়া দরকার যে শান্তি একটা খুব ছোট শব্দ কিন্তু খুবই দামী মানিক রত্নতুল্য এবং প্রতিটি জীবনের জন্য ভীষণ দরকারী। শান্তি কখনো ক্রয় করা যায় না; একে খুঁজে নিতে হয়। শান্তির জন্য মনের কসরত দরকার। শান্তির জন্য একটা নির্ভরতার জায়গা আছে তা অনুসন্ধান করা নিতান্তই আবশ্যক। ঈশ্বর সেই নির্ভরতার উৎসস্থল। আমাদের ঈশ্বর গোলযোগের ঈশ্বর নন, বরং শান্তির। 'সম্ভব হলে যতটা পার, সকলের সঙ্গে শান্তিতে থাকো।' *(রোমীয় ১২:১৮)*

সকলের সাথে শান্তিতে থাকার তাগিদ হৃদয়ে অনুভব করা একান্তভাবে প্রয়োজন। এই ধরনের অনুভূতি ছাড়া কেউ তাঁর দর্শনলাভে সক্ষম হয় না। ঈশ্বরের যে পবিত্রতা আছে তার অনুসন্ধান করা ছাড়া কেউ প্রকৃত শান্তির দূত হতে পারে না। তাঁর পবিত্রতার মধ্যদিয়েই পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। ঈশ্বরের প্রেমের এই বাস্তব উপলব্ধি আমাদেরকে অস্থিরতার মধ্যে স্থির রাখে। একমাত্র মনের শান্তিই পারে আমাদের জীবনকে পরিপূর্ণ করে তুলতে। তাই বলা যেতে পারে মন ও আত্মার শান্তিই প্রকৃত শান্তি। যা আমাদের জীবনে প্রভুর ভালবাসাকে উপলব্ধির মধ্যদিয়ে আসে। যে কোন প্রতিকূলতার সময় ধৈর্য ধারণ শান্তিতে থাকার আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই জন্য *রোমীয় ১২ অধ্যায় ১৮* পদটি মাঝে-মাঝে পাঠ করে ধ্যানমগ্ন হ'তে পারি। প্রয়োজনে পদটি বড়-বড় হরফে লিখে গৃহের উন্মুক্ত স্থানে সেঁটে রাখতে পারি যাতে চক্ষুদ্বয় বারংবার তা পাঠ করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে হৃদয়ে বার্তাটি বহন করতে পারে। প্রতিবেশিদের

অনেক রুঢ় আচরণ, মিথ্যা অভিযোগ গায়ে না মেখে ধৈর্য ধারণ করার অনুশীলন করা যেতে পারে। অনেক অসচেতন, অজ্ঞ, ঈর্ষাপরায়ণ, দুষ্ট প্রতিবেশি আছে যারা অনর্থক নিরীহগোছের শান্তিপ্রিয়দের প্রতি ঈর্ষাপূর্ণ আচরণ করে থাকেন। অন্যের ভাল থাকাকে সহ্য করতে পারেন না। এদের অনেকে ক্ষুদ্র অথচ তুচ্ছ ঘটনাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে শোরগোল পাকিয়ে আপনাকে অপদস্ত করতে পছন্দ করে, মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করে তার মধ্যে শান্তি খোঁজে। এহেন কুপমণ্ডুক দুষ্টগোছের মানুষগুলোর প্রতি সহিষ্ণু থাকার শক্তি ঈশ্বরের নিকট থেকে লাভ করার উত্তম উপায় প্রার্থনা করা। এই যোগ্যতাকে বলা যেতে পারে অন্যের দুর্বলতাগুলিকে বহন করা। বাইবেল আমাদের বলছে অন্যের দুর্বলতাগুলি বহন কর। মানসিক ও আত্মিক শান্তি ভঙ্গ করতে এই ধরনের দুষ্ট প্রতিবেশি অনেক ভূমিকা রাখে। এদের প্রতি ধৈর্যশীল থাকার অনুপ্রেরণা করুণাময় প্রভুর কাছ থেকে চেয়ে নিতে হবে। এই ধরনের ধৈর্য ধারণ মোটেও আমাদের দুর্বলতাকে প্রকাশ করে না। শক্তিমানেরাই শুধু পারে ধৈর্য ধরতে। এটা এক ধরনের খ্রিস্টের ক্রুশকে বহন করা। আমাদের আশে-পাশে যদি অবিশ্বাসীর বসবাস থাকে তো বলাই বাহুল্য, কি নিদারুণ ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়। এদের অনেকেই মনে করে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের প্রতি অত্যাচার করা কোন অন্যায় নয় বরং পূণ্যের। আমার একটা অভিজ্ঞতার সামান্য বর্ণনা এখানে প্রাসঙ্গিক হতে পারে। প্রায়ই আমাকে বাস্তব তিক্ততা বহন করতে হয়। ছোট জাত, খেরেস্তান কিংবা ফিরিঙ্গীর মতো অভিধা শুনতে হয়। এ ধরনের অজ্ঞ, কুপমণ্ডুক, ঈর্ষাপরায়ণ দুষ্ট মানসিকতা যন্ত্রণার হলেও আমলে না নেওয়াই ভাল। এদের মানসিকতাকে বদলানো সাধ্যাতীত। শুধু সর্বশক্তিমান স্রষ্টাই পারবেন। তাই তাঁর প্রতিই নির্ভর করে থাকি। একবার আমার বাড়ির পিছনের ভদ্রলোক (বিশেষভাবে অজ্ঞ ও স্বীকৃত দুষ্ট) আমার সেফটি ট্র্যাঙ্কের বাইরের মুখ অজ্ঞাথার্তে বন্ধ করে দিল; ফলে ময়লার লাইনের অন্যান্য অংশ দিয়ে দূর্গন্ধময় পানি বের হতে থাকে। আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হই। অনুসন্ধান করতে নজরে আসলো বাইরের মুখটি প্লাস্টিকের বস্তা দিয়ে বন্ধ করা। আমি নীরবে নিজ হাতে টেনে খুলে দিই। তবুও তাকে আজ পর্যন্ত কোন মন্দ কথা বলিনি। দুই-একজনকে জানিয়েছি। এই পরিবারটির নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি মারামারি লেগেই থাকে। ছেলেগুলো চোর এবং ছিনতাইকারী হিসাবে পরিচিত। আমার দিব্যজ্ঞানে মনে হয় এটাই বুঝি ওদের প্রতি সৃষ্টিকর্তার অনুশাসন। শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কায় নীরবতাই আসল সমাধান। এইরূপে কোন-কোন সময় নিজেদের পরিবারে ভুল বোঝাবুঝিতে সৃষ্ট সমস্যা তৈরী হতে পারে। এক্ষেত্রেও নীরব ধৈর্য ধারণের মধ্যদিয়েই শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকা বই গত্যন্তর নাই। এই ক্ষেত্রে কয়েকজন মনীষীর বাণী মানানসই হতে পারে। যেমন-"যদি শান্তিতে বসবাস করতে চাও তবে তোমার প্রতিবেশির সহযোগিতা লও। তোমার প্রতিবেশির ঘরে যখন আগুন জ্বলে, তোমার নিজেরই নিরাপত্তা তখন বিপন্ন হবে। এবং যে ব্যক্তি প্রতিবেশির ক্ষতিসাধন করে, সে নিজের পদদ্বয়ে নিজেই জাল আবৃত করে।"

অসাধু, দূষ্কর্মকারী, পরশ্রীকাতর এবং লোভী ব্যক্তিগণ কখনো অন্তরে শান্তি অনুভব করে না। অসহিষ্ণুতা, অধৈর্যশীলতা, মানসিক অস্থিরতা হেতুই শান্তি বিঘ্নিত হতে থাকে। যাদের গৃহে শান্তি বজায় থাকে ঈশ্বর তাদেরকে ভালবাসেন। গৃহের পরিবেশ শিশুসহ অন্যদের মনে প্রভাব বিস্তার করে। তাই প্রতিটি পরিবারে শান্তি বজায় রাখার ব্যাপারে সকলের সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হয়। পরিবারের প্রধানসহ সকলকে বিবেচনার সাথে ধৈর্যশীলতার পরিচয় বহনপূর্বক জীবন-যাপন করা আবশ্যক। পরিবার যদি শান্তির জায়গা হয়ে ওঠে তবে ঐ পরিবারের শিশুরা সুস্থ মানসিকতা ও সুস্থ মূল্যবোধ নিয়ে বিবেচক মানুষ হয়ে ওঠে। সকলের মননে যদি এটা বিরাজ করে যে প্রভু ঈশ্বরই পরিবারের কর্তা তবে সব সমস্যার সমাধান স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয়ে যেতে পারে। সুখ-শান্তি কখনও ধন-সম্পত্তি, অর্থ বা জাগতিক জ্ঞান-বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে না। সুখের বাস আত্মার গহীনে। অন্তর-মন যাদের সরল ও উদার তারা সুখকে উপলব্ধি করতে সক্ষম। সঙ্কীর্ণতা ও হীনমন্যতায় আবদ্ধ যারা তারা সব কিছুকে নিজের ক্ষুদ্র মানসিকতায় দেখতে অভ্যস্ত এবং এই শ্রেণীর মানুষগুলো অন্তর জ্বালায় আহত হতেই থাকে। 'কুকর্ম থেকে তোমার জিহ্বা মুক্ত রাখ, ছলনার কথা থেকে তোমার ওষ্ঠ, পাপ থেকে সরে গিয়ে সৎকর্ম কর, শান্তির অন্বেষণ করে কর অনুসরণ।' *(সাম : ৩৪:১৪-১৫)* হিংসা, ছলনা, দুষ্টতাকে পরিত্যাগ করতে শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন আছে। অন্যদিকে শুধুমাত্র নিজে সবদিক দিয়ে ভাল বা শান্তিতে থাকার অর্থ প্রকৃত শান্তি নয়। যেমন শারিরীকভাবে সুস্থ থাকা, মানসিকভাবে সুস্থ থাকা, সামাজিকভাবে এবং আত্মিকভাবে সুস্থ থাকার মধ্যেই চরম সুখ। যদিও শান্তিকে কোন স্কেলে পরিমাপ করা যায় না। যে পরিবারে বাস করি, যারা আমাদের প্রতিবেশি, আমাদের চারপাশের পরিবেশ সবকিছুর সু-সম সুস্থতার মধ্যে আসল শান্তি নির্ভর করে। তবে ঈশ্বরবিহীন সবই শুন্য এবং নিষ্ফল। 'যৌবনের যত দুর্মতি এড়িয়ে চল, যারা শুদ্ধ হৃদয়ে প্রভুকে ডাকে, তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ধর্মময়তা, বিশ্বাস, ভালবাসা ও শান্তির অন্বেষণ কর। তাছাড়া অসার ও গঠনমূলক নয় এমন আলাপ-আলোচনা থেকে দূরে থাক। তুমি তো জান এসব কিছু বিবাদ সৃষ্টি করে।' *(২ তিমথি ২:২২)*

পরিশেষে বলা যেতে পারে অতিশয় উচ্চাশা যেখানে শেষ হয়, সেখান থেকেই শান্তির যাত্রা শুরু হতে পারে। প্রচুর ভোগ বিলাসের ইচ্ছা মনের মধ্যে গিজ-গিজ করতে থাকলে শান্তি কোথা থেকে আসবে? এই নশ্বর পৃথিবীর রূপ, লাবণ্য, রস, চাকচিক্য প্রতিনিয়ত আমাদের প্রলোভিত করছে আর এগুলির হাতছানি থাকা সত্ত্বেও যদি বিচলিত না হই; তবেই শান্তি রক্ষা পায়। আমাদের মনে মন্দ তৎপরতা, উগ্রতা, অসহিষ্ণুতার এবং অবিশ্বস্ততার প্রলোভন সব সময় হাতছানি দেয়। তাই বাস্তব জীবনে ঘন-ঘন খ্রিস্টের ক্রুশের দিকে মাথা তুলে চেয়ে দেখার অভ্যাস গড়ে উঠলে অন্তরে এক অনাবিল শান্তির আমেজ গুনগুনিয়ে উঠবে। একজনের প্রশান্তিময় জীবন অন্য একটা দুর্বিসহ জীবনের নিকট প্রেরণার উৎস হয়ে উঠতে পারে। হিতৈষী বন্ধুগণ, এধরনের ইচ্ছা পোষন আর প্রচেষ্টা চালাতে দোষ কোথায়? খ্রিস্ট তো আমাদেরকে তাঁর শান্তির দূত হিসাবে দেখতে চান। ঈশ্বরের দেওয়া মহানুগ্রহ ও কৃপা আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। তাই অন্যের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ইচ্ছা ও প্রেরণা শান্তিরাজ খ্রিস্ট থেকে পাবার অনবদ্য বিশ্বাস স্থাপন একান্তভাবে দরকার। শান্তির বাতায়ন তৈরী করতে হলে নম্রভাবে কথা বলার অভ্যাস এবং প্রতিনিয়ত তা চর্চা করা বড় একটা বিবেচনার বিষয়। "একে অপরের সাথে শান্তি রাখ" সাধু পৌলের এই আর্জির মর্মার্থ উপলব্ধি করে: শান্তির প্রচেষ্টায় অব্যাহত থাকি। শান্তিতে থাকা এবং শান্তির আবহ তৈরীতে ব্যক্তির অহংকার, স্বার্থপরতা, হিংসা, ঘৃণা, মূল্যবোধের ঘাটতি এবং অজ্ঞতা বড় অন্তরায়। শান্তিতে থাকার পজিটিভ মানসিকতা দিয়ে এই বাঁধাগুলিকে অপসারণ করা সম্ভব।

মনের আনন্দপূর্ণ শান্তভাব হল শান্তি। মন এবং আবেগকে যেভাবে চালানো যাবে সেভাবেই শান্তি থাকবে। শান্তি আমাদের ভিতরেই লুকিয়ে আছে। নিজেকে প্রস্তুত করার মধ্যেই সেই আকাঙ্ক্ষিত শান্তি নির্ভর করে। যখন আমরা পবিত্র আত্মার অধীনে থাকি তখন আমরা শান্তিতে থাকি। তখন অনর্থক সম্পদের বা জাগতিক জ্ঞানের দর্প বা অহংকার থাকে না। হিংসা-দ্বেষ, অন্যকে হেয় করার প্রবণতা থাকে না। এমনতর অবস্থায় শান্তি বজায় থাকবে। ঈশ্বরের বাক্য যে হৃদয়ে সঞ্চিত সে ধন্য। কেননা 'বাক্যই' শান্তির মূল উৎস॥ ❑

হানিমুন মুড

খোকন কোড়ায়া

সেল ফোনের অ্যালার্মে ঘুম ভাঙ্গে অনন্ত'র। আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠতে যাবে, অবন্তী একটা হাত ওর বুকের উপর তুলে দিয়ে বললো- এত তাড়াতাড়ি ওঠে পড়ছো যে! অনন্ত ওর হাতের উপর নিজের একটা হাত স্থাপন করে বললো - আজ থেকে অফিস শুরু হচ্ছে মনে নেই। অবন্তী হঠাৎ অনন্ত'র কানের লতিতে কুট করে একটা কামড় দিয়ে বললো -আজ অফিসে না গেলে হয় না? অনন্ত খানিকটা অবাক হলো। একটু সময় নিয়ে বললো - এতদিন পর অফিস খুলছে, না গেলে কেমন হয়! অবন্তী চোর ধরার মত আষ্টেপৃষ্ঠে অনন্তকে জড়িয়ে ধরে বললো, না, আজ অফিসে যাবে না। অনন্ত'র বয়স পঞ্চাশ, অবন্তীর পয়তাল্লিশ। অনেকদিন ধরেই এরকম হান-মুন মুডে অবন্তীকে পায় না অনন্ত। অতঃপর অনন্তও ভেসে যায়।

আরো ঘন্টাদেড়েক ঘুমিয়ে ফ্রেস হয়ে ডাইনিং টেবিলে গিয়ে অনন্ত জিজ্ঞেস করে - অন্তরা নাস্তা করেছে? টোস্টে পিনাট বাটার লাগাতে-লাগাতে অবন্তী বলে - তোমার মেয়ে দেরি করে ঘুম থেকে ওঠেছে, তার অনলাইন ক্লাস শুরু হয়ে গেছে, নাস্তা করার সুযোগ হয়নি। আজ যে অফিসে যেতে পারছো না, সেটা তোমার বসকে জানিয়েছো? তাড়াতাড়ি খেয়ে তোমার বসকে ফোন করে জানাও যে তোমার ডায়রিয়া হয়েছে, তারপর রান্নাঘরে আসো কথা আছে।

বসকে ফোন করে রান্নাঘরে এসে অনন্ত বলে - কী জানি বলবে, বলছিলে?

অবন্তী একটু হেসে বলে - তোমার কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছি। অনন্ত অসহায়ের মত বলে - কাজ! অবন্তী আরো একটু কম হেসে বলে - জ্বি মিস্টার, কাজ। সিঙ্কের দিকে তাকাও। অনন্ত সিঙ্কের দিকে তাকিয়ে আট্‌কে ওঠে - পাহাড় সমান থালা-বাসন আর হাড়ি-পাতিল। অবন্তী কিঞ্চিত হেসে বলে-ভয় পেলে? ওগুলি কিন্তু গত রাতেই মাজার কথা ছিলো তোমার। চালাকি করে বললে - শরীরটা ভালো নেই, সকালে মেজে দেবো। ভেবেছিলে, সকালে তাড়াহুড়ো করে অফিসে চলে যাবে, তারপর তোমার টিকিটির নাগালও আমি পাবো না। যাহোক ওগুলি আগে মেজে দাও। তারপর কিছু পেঁয়াজ কাটতে হবে, আলু ছিলতে হবে, আর দাড়োয়ানকে দিয়ে লালশাক আনিয়েছি ওগুলো বেছে দিতে হবে। তারপর আদা রসুন ছিলে টুকরো-টুকরো করে রাখবে, বিকেলে ওগুলো ব্লেন্ড করে দেবে। অনন্ত আর্তনাদ করে উঠলো - এত্ত কাজ! অবন্তী এবার উদারভাবে হেসে বলে - তাহলে জনাব কি ভেবেছিলে, অফিস কামাই করালাম বাসায় বসিয়ে রেখে তোমাকে শুধু দেখবো বলে!

সুখ সাগর

কৃষ্টিনা হীরা

সুখের নেশায় ঘুড়ি-ফিরি চারিদিক ময়
কোথায় সুখ, কোথায় সুখ, একটু সুখ দাও না আমায়।
পৃথিবীতে সুখ বলে কিছু নেই,
সুখ পাখিটা থাকে যে অচিনপুরে।
কেনো সুখ পাখিটার পিছনে ঘুরছ?
মিছে মায়ায় মিছে অন্বেষণ কেন করছ?
ধন-দৌলত, অহংকার-অহমিকার মাঝে
সুখ খুঁজে পাওনি কি এতটুকু?
মান-সম্মান আধিপত্যের মাঝে।
হাতছানি দিয়ে সুখ ডাকেনি তোমায়?
সুখ সাগর থেকে ঘুরে এলাম আমি
সেখানে তো কোন সুখ নেই, সুখ নেই!
এত বড় সুখ সাগরে, সুখের বিন্দুমাত্র নেই
আছে শুধু দুঃখ-যন্ত্রণা, অশ্রু জলের লেশ
সুখ আসে স্বর্গ হতে আবার চলে যায় স্বর্গে
প্রাণ পাখিটা সুখ খুঁজে পায় মনের আনন্দে।
রমনী সুখ খুঁজে নাও তোমার স্বামীর বক্ষেতে
সন্তানেরা সুখ খুঁজে পায় পিতা-মাতার কোলেতে।
সুখ-সুখ বলে কেন ঘুরছো ত্রি-ভুবনেতে
সুখ সাগরের ফোয়ারা তো তোমার মনেতে।
সুখের স্বর্গ গড়তে হয় নিজ মনেতে
তবেই তো সুখ সাগরের দেখা মিলবে।
প্রেমিক যেমন সুখ খুঁজে পায় প্রিয়ার বুকে
তেমনী তুমিও সুখ খুঁজে নাও ধরণীর বুকে॥

ক্ষণিকের সুখে ভুলো না অতীত

পদ্মা সরদার

করেছো কতো কি অতীতের লাগি
আজ অতীত ভুলেছে তোমায়
অতীত যা, সে তো শুধুই অতীত
সে তো আর কারো নয়।
ভুলো না তুমি সামনে গিয়ে
পেছনের পথগুলো
মাড়াতেই হবে একদিন সে পথ
গায়ে লাগিবে ধূলো।
যতোই এড়াবে সে পথ তুমি
ততোই হইবে পতন
চিনিতে পারিবে না একদিন তারে
খোলোশ ছাড়িবে নতুন।
একে-একে সব পেছনের লোক
সামনে এগিয়ে যাবে
স্মরিবে তখন কি হারাইলে
কি বা পাইলে কবে।
পুরানোকে ভেঙ্গে কি ভেবেছো
পেয়েছো অমূল্য ধন
পুরোনোই আছে পুরোটা জুড়ে
শুধু দূষিত করেছো মন॥

খ্রিস্ট মণ্ডলীতে মারীয়ার পর্ব

(পূর্ব প্রকাশের পর)

২৩) গুয়াদালুপের রাণী মারীয়া (Our Lady of Guadalupe): ১২ ডিসেম্বর, স্মরণ দিবস

জুয়ান দিয়েগো একজন মেক্সিকান (আজতেক) ইণ্ডিয়ান। তিনি ছিলেন বিপত্নীক যিনি পঞ্চাশ বছর বয়সে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন। দীক্ষাস্নানের ছয় বছর পর ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে, ৯ ডিসেম্বর মেক্সিকো নগরের কাছে, ধন্যা কুমারী মারীয়া তাকে দর্শন দান করেন।

ঐ দিন সকালে কুমারী মারীয়ার সম্মানার্থে খ্রিস্টযাগে যোগদান করতে যাওয়ার সময় পাহাড়ের পাদদেশ তিনি হঠাৎ মনোরম একটি সঙ্গীত শুনতে পান আর দেখতে পান তাঁর সামনে উজ্জ্বল মেঘের মধ্যে দাঁড়ানো একজন যুবতী। যুবতীটির চেহারা তাঁর আপন জাতি 'আজতেক' রাজকুমারীর মতো। তিনি জুয়ান দিয়েগোর সাথে আজতেক ভাষায় কথা বলেন এবং মেক্সিকোর ধর্মপালের মাধ্যমে এই পাহাড়ে একটি গির্জা নির্মাণ করার জন্য অনুরোধ করেন। ধর্মপাল দিয়াগোর কাছে সেই নারীর কাছ থেকে প্রমাণ-স্বরূপ একটি নিদর্শন চান। খ্রিস্টযজ্ঞের প্রার্থনাসঙ্কলন গ্রন্থে এই পর্ব দিনের ভূমিকায় বলা হয় "তিনদিন পরে মা মারীয়া দিয়েগোকে আবার দর্শনে বলেন, তিনি যেন তাঁর পায়ে ছড়িয়ে পড়া গোলাপ ফুলগুলিকে কুড়িয়ে নিয়ে তাঁর চাদরে রেখে তা ধর্মপালের কাছে নিয়ে যান। জুয়ান দিয়েগো যখন ধর্মপালের সামনে তাঁর চাদর খুলে ধরেন, তখন গোলাপ ফুলগুলি মাটিতে পড়লে দেখা যায়, চাদরের ওপর মা মারীয়ার ছবি আঁকা আছে, ঠিক যেমন চেহারায় তিনি দর্শন দিয়েছিলেন। সেই দিনটি ছিল ১২ ডিসেম্বর। এরপর থেকে অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় নব্বই লাখ আদিবাসী ইণ্ডিয়ান খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে। মা মারীয়া যে জুয়ান দিয়েগোকে একজন আদিবাসী নারীর মতো দর্শন দিয়েছিলেন, তার মধ্যে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঈশ্বর মা মারীয়াকে পাঠিয়েছেন, তিনি যেন নির্বিশেষে সকল জাতির মানুষকে আপন করে নেন।" অনেকগুলো দেশ নিয়ে উত্তর আমেরিকা মহাদেশ গঠিত এবং এটি লাতিন আমেরিকা নামে পরিচিত। বিচিত্র জনগোষ্ঠী নিয়ে মহাদেশটির মধ্যে জাতি-বর্ণ-বৈষম্য রয়েছে। মা মারীয়ার এই দর্শনের মধ্যদিয়ে মানুষের মধ্যে বিশ্বাস ও মানবিক চেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে। খ্রিস্টযাগের প্রার্থনা বইয়ে বলা হয়েছে "সেই সময় যখন স্পেনীয় ঔপনিবেশিকেরা আদিবাসী ইণ্ডিয়ানদের নিন্দা করত, তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করত, মা মারীয়া তখন ইঙ্গিত দেন যে, আদিবাসীরাও ঈশ্বর-সন্তানের মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য, তাদের সংস্কৃতির মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করা যায়।"

২৪) শুভ বড়দিন (The Birth of the Lord): ২৫ ডিসেম্বর

গোটা বিশ্বের মধ্যেই বড়দিন উৎসবটি সবচেয়ে বেশি পরিচিত এবং উৎসব ও আনন্দময় পরিবেশে উদ্‌যাপন করা হয়। আদি মণ্ডলীতে যিশুর জন্মোৎসব বা বড়দিন উদযাপনের প্রচলন ছিল না। যিশুর জন্মোৎসবকে বাংলায় বড়দিন বলা হয়। কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত *(১৮১২-১৮৫৯)* যিশুর জীবনাদর্শ ও মাহাত্ম্যকে প্রাধান্য দিয়ে তাঁর জন্মদিনকে 'বড়দিন' নামে আখ্যায়িত করেন। ইংরেজি Christmas শব্দটি এসেছে পুরাতন ইংরেজি Cristes maesse or Cristes-messe থেকে যার অর্থ হলো Christ's Mass or Mass of Christ অর্থাৎ 'যিশুর জন্মের স্মরণে খ্রিস্টযাগ'। বড়দিনকে ঘিরে গোটা বিশ্বেই বিচিত্ররকম উৎসবের আয়োজন করা হয়, তবে যিশুর জন্ম স্মরণে খ্রিস্টযাগ ব্যতীত কোন বড়দিন উৎসব নেই। আলেকজান্দ্রিয়ার সাধু ক্লেমেন্টের *(১৫০-২১৫)* লেখায় মিশরে ২০০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বড়দিন উৎসব উদ্‌যাপনের বর্ণনা পাওয়া যায়। রোমীয়দের মধ্যে ৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট কনস্টানটাইন যিশুর জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করেছেন। সাধু জন ক্রিসোস্তম *(৩৪৭-৪০৭)* যিশুকে 'ন্যায়ের সূর্য' বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং যিশুর জন্মদিন উদ্‌যাপনের ওপর জোর দিয়েছেন। প্রাচ্য মণ্ডলীসহ কয়েকটি মণ্ডলীতে যিশুর আত্মপ্রকাশ পর্বের সময় বড়দিন উদ্‌যাপন করে। ১২২২ খ্রিস্টাব্দে আসিসির সাধু ফ্রান্সিস (১১৮১-১২২৬) বড়দিনের গোশালার প্রচলন শুরু করেন। যুগে-যুগে বড়দিনকে ঘিরে 'ক্রিসমাস ট্রি', কবিতা সাহিত্য, কীর্তন গান, ক্রিসমাস কার্ডসহ বহু কিছু সৃষ্টি হয়েছে।

বড়দিনকে চিত্রায়িত করতে গেলে মা মারীয়ার উপস্থিতি অবশ্যই প্রাধান্য পায়। খ্রিস্টের দেহধারণের মহান রহস্যটি মা মারীয়ার মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করেছে *(যোহন ১:১-৪)*। বড়দিন কেন্দ্রিক শিল্প, সাহিত্য, চিত্র, গোশালাসহ আরও অনেক কিছুতে মা মারীয়া বিদ্যমান। মাতৃগর্ভ থেকেই যিশু মারীয়ার সাথে সম্পৃক্ত এবং শিশু-কৈশোর ও ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত মারীয়া যিশুর সাথে ছিলেন। বড়দিনে তাই যিশুর জন্মের সাথে মারীয়ার নামটি অবশ্যই উচ্চারিত হয় এবং তঁর মধ্যদিয়ে বড়দিন উৎসবের পূর্ণতা লাভ করে।

২৫) পবিত্র পরিবারের পর্ব (The Holy Family) বড়দিনের পরবর্তী রবিবার

যিশু মারীয়া ও যোসেফকে নিয়েই নাজারেথের পবিত্র পরিবার। মণ্ডলীর শিক্ষায় বলা হয় পরিবার হল 'গৃহ মণ্ডলী' আর সমাজ বিজ্ঞানীরা বলেন 'পরিবার হল সমাজের ক্ষুদ্র কোষ'। মণ্ডলী বরাবরই আদর্শ পরিবার গঠনের শিক্ষা দিয়ে থাকে এবং নাজারেথের পবিত্র পরিবারই হলো সকল খ্রিস্টীয় পরিবারের আদর্শ। পবিত্র পরিবারের মধ্যদিয়ে ত্রিত্ব ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশিত হয়। মিশরের কপটিক রীতি অনুসারে খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের মধ্যে পবিত্র পরিবারের পর্ব পালনের প্রথা প্রৈরিতিক যুগ থেকে প্রচলিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে পাশ্চাত্য মণ্ডলীতে পবিত্র পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি বৃদ্ধি পায়। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে পবিত্র পরিবারের পর্ব হিসেবে পালন করা হয়। প্রথম দিকে পবিত্র পরিবারের পর্বটি যিশুর আত্মপ্রকাশ পর্বের দিনেই উদ্‌যাপন করা হতো। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে এই পর্বটি বড়দিনের পরের রবিবারে পালন করার রীতি শুরু হয়। পোপ সপ্তম পিউস *(১৮০০-১৮২৩)* পরিবারের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং পারিবারিক শিক্ষার মধ্যে খ্রিস্টীয় গুণাবলীগুলো বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়েছেন। খ্রিস্টমণ্ডলী বরাবরই আদর্শ পরিবার গঠনের শিক্ষা দিয়ে থাকে এবং পবিত্র পরিবারকে সকল পরিবারের আদর্শ বা নমুনা হিসেবে গ্রহণ করার অনুপ্রেরণা দেয়॥ (সমাপ্ত)

প্রকৃতিপ্রেমী ফিলিপ

জাসিন্তা আরেং

শিমুলতলি নামে একটি ছায়াঘেরা গ্রামে ফিলিপ নামে এক অলস ও প্রকৃতি উদাসীন ছেলে বাস করত। তারা ছিল দুই ভাই-বোন। তাদের দুই ভাই-বোনের স্বভাবে ছিল বেশ পার্থক্য। তার বোন আন্না ভোরে উঠে বাগানের গাছপালার যত্ন নিত। ফিলিপ ছিল বড্ড অলস, প্রকৃতি যত্নে ছিল তার উদাসীনতা। যেখানে যেত, সেখানেই গাছের পাতা-ফুল ছিঁড়ে ফেলার একটা প্রবণতা তার মধ্যে ভীষণভাবে কাজ করত। বিদ্যালয়ে গিয়েও একই কাজ করত যার ফলে কয়েকদিন শাস্তিও পেতে হয়েছিল। বরাবরের মতই ফিলিপ দেরী করে ঘুম থেকে উঠে সেদিন বিদ্যালয়ে গেল। সেদিনটি ছিল বৃক্ষরোপণ দিবস। ফিলিপ সেদিন তার শিক্ষকের কাছ থেকে জানতে পারল কিভাবে গাছপালা-ফুল-ফল আমাদের প্রয়োজন মেটায় এবং আমাদের বেঁচে থাকতে সহায়তা করে। ফিলিপ আগ্রহ সহকারে শিক্ষককে জিজ্ঞেস করল, "স্যার, গাছপালা যত্ন নেয়ার প্রয়োজনীয়তা কি? প্রকৃতির যত্ন না নিলে কি বেড়ে উঠতে পারে না?" শিক্ষক উত্তরে বললেন, "গাছ আমাদের সবচেয়ে ভাল বন্ধু, তাই গাছের পাতা-ফুল না ছিড়ে তাকে বেড়ে উঠতে দিতে হবে। প্রয়োজনে প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার এবং যত্ন করতে হবে।" শিক্ষকের কথা শুনে ফিলিপ মনে-মনে অনুতাপ করতে লাগল। ফিলিপ শিক্ষককে বলল, "স্যার, আমিও কি প্রকৃতির যত্ন নিতে পারি?"

শিক্ষক তাকে বললেন, "নিশ্চয়, তুমিও প্রকৃতির যত্ন নিতে পার। তুমি তোমার বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে যেসব গাছপালা আছে, সেসবের যত্ন নিতে পার। বিকালে খেলাধূলার পর সময় করে গাছে পানি দিতে পার, গাছের চারপাশের আগাছা পরিষ্কার করেও গাছের যত্ন নিতে পার। বাড়ির আশেপাশে খোলা জায়গা থাকলে বিভিন্ন ফলের গাছও রোপণ করতে পার। এতে করে কয়েক বছর পরে গাছের ফলও পাবে, ছায়াও পাবে। কিন্তু গাছগুলোর নিয়মিত যত্ন নিতে হবে।" শিক্ষকের কথা শুনে ফিলিপ কিছুটা ভাবুক হয়ে গেল। সেদিনের মত ক্লাস শেষ করে সে বাড়ি ফিরে গেল। রাতে ঘুমানোর আগে ফিলিপ তার বোন আন্নার কাছে জানতে চাইল কেন সে সকালে ঘুম থেকে উঠে গাছে পানি দেয়? আন্না বলল, 'গাছ অনেক উপকারী। তাই আমি গাছপালার যত্ন নিতে ভালবাসি এবং গাছপালাও আমাকে ভালবাসে।' গাছপালার প্রতি আন্নার ভালবাসা দেখে সেও উপলব্ধি করল যে সে প্রকৃতির প্রতি কতটা রুঢ় ও উদাসীন। শিক্ষকের কথা ও প্রকৃতির প্রতি আন্নার প্রেম দেখে ফিলিপও অনুপ্রাণিত হলো এবং প্রকৃতির যত্নে সেও কাজ করবে বলে ঠিক করল।

পরদিন ফিলিপ খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে বাগানের গাছপালার যত্ন নিতে শুরু করল। আন্না ঘুম থেকে জেগে দেখে ফিলিপ বিছানায় নেই। সে রীতিমত অবাক হলো। সাধারণত এত সকালে ঘুম থেকে ওঠার কথা নয়। রুমের জানালা দিয়ে দেখতে পেলো যে সে বাগানে পানি দিচ্ছে। তার এ পরিবর্তন দেখে সে খুবই আনন্দিত হলো। এরপর প্রতিদিন তারা দুই ভাই-বোন একসঙ্গে সকাল-বিকাল প্রকৃতির যত্ন নিতে শুরু করল। তাদের মা-বাবার সাথে কথা বলে তারা সিদ্ধান্ত নিল যে তারা প্রতিবছর ফলজ ও গাছের চারা রোপণ করবে ও তা বেড়ে উঠতে সাহায্য করবে। তাদের মা-বাবা বৃক্ষরোপণের প্রস্তাব শুনে তাদের ভূয়সী প্রশংসা করল। এভাবেই ফিলিপ প্রকৃতির ভালবাসায় বেড়ে উঠতে লাগল এবং একই সাথে তার যত্ন ও ভালবাসায় গাছগুলিও বেড়ে উঠতে লাগল।

তাহলে ছোট্ট বন্ধুরা, ফিলিপের প্রকৃতিপ্রেমী হয়ে ওঠার গল্পটি আমাদেরকেও অনুপ্রাণিত করে যেন আমরাও প্রকৃতির প্রতি উদাসীনতা কাটিয়ে প্রকৃতিকে ভালবাসতে পারি ও তা যত্নের সাথে-সাথে সংরক্ষণও করতে পারি॥ ❑

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

পরচর্চা কোভিড-১৯ থেকেও ভয়ঙ্কর মহামারী

- পোপ ফ্রান্সিস

গত রবিবারে (৬/৯/২০২০) দূত সংবাদ প্রার্থনার পূর্বে পোপ মহোদয় উক্ত দিনের মঙ্গলসমাচার, যেখানে যিশু ভ্রাতৃসুলভ সংশোধনের কথা তুলে ধরেছেন তার ওপর অনুধ্যান রাখেন। তিনি বলেন, আজকের পাঠটি আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনের দু'টি ধারার ওপর আলোকপাত করে। প্রথমত সমাজগত/সংঘবদ্ধ দিক; যা সমাজের মিলনকে সুরক্ষা করার দাবি করে এবং দ্বিতীয়ত ব্যক্তিগত দিক; যা প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেকের জন্য সম্মান ও শ্রদ্ধা দানে অনুগত থাকে। পুণ্যপিতা বলেন, পাপী একজন ভাই-বোনকে সংশোধিত করতে যিশু তিন ধাপ পদ্ধতি আমাদেরকে দান করেন।

১ম ধাপ: বিচক্ষণতার সাথে সতর্ক/সংশোধন করা

আমরা আহ্বান পেয়েছি বিচক্ষণতার সাথে ব্যক্তিকে সংশোধন করতে, 'কাউকে বিচার করতে নয় কিন্তু ব্যক্তি কি করেছে তা উপলব্ধি করতে সাহায্য করা।' পোপ ফ্রান্সিস স্বীকার করেন যে, ১ম ধাপটি সম্পন্ন করা এতো সহজ কাজ নয়। কেননা যাকে সংশোধন করা হবে সে হয়তো বাজেভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে, ব্যক্তিকে সংশোধন করার জন্য আমার পর্যাপ্ত আস্থা না থাকা এবং এ ধরণের আরো অনেক কারণে এ কাজ সহজ নয়।

২য় ধাপ: সহায়তা নেওয়া

ব্যক্তিগত সংশোধন দানের পরে ব্যক্তি যদি অনুতাপী না হয়, তখন আমাদেরকে ভাইবোনদের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়ার উদাত্ত আহ্বান করেন যিশু। পোপ মহোদয় উল্লেখ করেন, মোশীর নিয়ম-কানুন থেকে কিন্তু এ ২য় ধাপ আলাদা। কেননা মোশীর বিধান অনুযায়ী ২/৩জন সাক্ষীর বদৌলতে কাউকে অভিযুক্ত করা যেতো। কিন্তু যিশুর দেওয়া এই ২য় ধাপে কাউকে অভিযুক্ত করতে নয় কিন্তু সহায়তা করতে আহ্বান করা হয়েছে।

৩য় ধাপ: মণ্ডলীকে জানানো ও সাহায্য নেওয়া

২য় উদ্যোগের পরও যদি কোন ব্যক্তি ভূল-ভ্রান্তি অব্যাহত রাখে তাহলে তৃতীয় পদক্ষেপ হিসেবে মণ্ডলীর কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করতে হবে। কেননা সংশোধনের প্রয়োজন ব্যক্তির পুনর্বাসনের জন্য হয়তো অনেক বেশি ভালোবাসা দরকার যা সে মণ্ডলীর কাছ থেকে পেতে পারে এবং এমন অনেক বিষয় আছে যা মণ্ডলীর ভাইবোনদের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। তাই মণ্ডলীর কাছে কোন বিষয়ে অনুরোধ করা একান্ত দরকার।

সমাজের এতসব উদ্যোগ হয়তো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। ঐ অবস্থায় যিশু বলছেন, সংশোধনের প্রয়োজন ব্যক্তিকে বিধর্মী বা করগ্রাহক হিসেবে বিবেচনা করতে। পোপ মহোদয় উল্লেখ করেন, এটি একটি ধিক্কারজনক প্রকাশ হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে, আমাদের সকলকে আহ্বান করা হচ্ছে যেন আমরা সংশোধনের প্রয়োজন ব্যক্তিকে ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করি; কেননা প্রেমময় ঈশ্বরের ভালোবাসা আমাদের ভাইবোনদের ভালোবাসা থেকে বৃহত্তর। যে মহত্তম ভালোবাসায় যিশু বিধর্মী ও করগ্রাহকদেরও তাঁর শিষ্য করেছিলেন।

পোপ মহোদয় আরো বলেন, পরচর্চা আমাদের সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। আমরা যখন আমাদের সমাজের একজন ভাই বা বোনের ভুল/ত্রুটি দেখি; তখন প্রথমেই আমরা ছুটে যাই অন্যজনের কাছে তা তুলে ধরতে। আমরা পরচর্চা শুরু করি, গুজব রটাই। পরচর্চা বা গুজব সমাজের কাজে একজন ব্যক্তির হৃদয় বন্ধ করে দেয় এবং মণ্ডলীর একতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। মনে রাখতে হবে, শয়তান হলো সেই দাম্ভিক গুজব রটনাকারী যে বিবাদের বীজ রোপণ করতে চায়। ভাইবোনেরা, এসো, আমরা পরচর্চা না করার চেষ্টা করি। কেননা পরচর্চা মহামারী কোভিড-১৯ থেকেও ভয়ঙ্কর মহামারী।

আসিসিতে ৩ অক্টোবর 'সকল ভ্রাতা' নামক সর্বজনীন পত্রে স্বাক্ষর করবেন পোপ ফ্রান্সিস

৫ সেপ্টেম্বর ভাতিকানের প্রেস অফিসের পরিচালক, মাত্তেয় ব্রুনি এক বিবৃতিতে জানান, আগামী ৩ অক্টোবর পোপ ফ্রান্সিস ইতালির আসিসি পরিদর্শনে যাবেন এবং ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক বন্ধুত্বের ওপর 'সকল ভ্রাতা' (Fratelli tutti বা "All Brothers") নামক সর্বজনীন পত্রটি স্বাক্ষর করবেন। পত্রটির ইংরেজি শিরোনাম এখনো ঠিক হয়নি।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ৩ অক্টোবর দুপুরের মধ্যে আসিসি এসে পৌঁছবেন এবং আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের কবরে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করবেন। খ্রিস্টযাগের পরপরই তিনি সেই সর্বজনীন পত্রে স্বাক্ষর করবেন। পোপ মহোদয়ের এই পরিদর্শন ও অন্যান্য ক্রিয়া জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়াই হবে। আসিসির বিশপ দমেনিকো সরেনন্তিনো বলেন, আসিসি শহর আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা নিয়ে পোপের পরিদর্শনের জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি আরো বলেন, মহামারীর কারণে বিশ্বের অনেকের জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠেছে, তবে ব্যথা বেদনায় একজন আরেকজনের ভাই হয়েছি। তবে ভালবাসার কারণেই আমরা একজন আরেকজনকে ভাই বলে অনুভব করি। পোপ মহোদয়ের আগমন আমাদেরকে সকলকে নতুনভাবে উৎসাহ ও শক্তি দিবে একতাবদ্ধভাবে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তুলতে।

পোপ মহোদয়ের নতুন সর্বজনীন পত্রের শিরোনাম 'সকল ভ্রাতা' তার শিক্ষার কেন্দ্রীয় বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়। ১৩ মার্চ ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে পোপ হিসেবে নির্বাচনের পর পোপ ফ্রান্সিস সকল জনতাকে 'ভাই' বলে স্বাগত-সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন। অভিবাসী-উদ্বাস্তুদের ভাই বলে আলিঙ্গণ করছেন সবসময়। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে আবুধাবী পরিদর্শনে 'মানব ভ্রাতৃত্ব' নামক দলিলে স্বাক্ষর করেন। এই সবকিছুতে প্রকাশ করে পোপ ফ্রান্সিস তাঁর শিক্ষাতে ভাই বা ভ্রাতৃত্ববোধের ওপর বিশেষ জোর দেন।

- তথ্যসূত্র : news.va

পোপ (এমিরিতুস) ষোড়শ বেনেডিক্ট ইতিহাসের প্রবীণতম পোপ

গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার পোপ (এমিরিতুস) ষোড়শ বেনেডিক্ট ৯৩ বছর ৫ মাসে পদার্পণ করলেন আর এর মধ্যদিয়ে ইতিহাসের প্রবীণতম পোপ হওয়ার ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। এপ্রিল ১৬, ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণকারী পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টের পূর্বনাম যোসেফ রাৎসিঙ্গার। ইতালির বিশপ সম্মিলনীর পত্রিকা আভ্যেনির ও ফামিলিয়া খ্রিস্টিয়ানা জানায়, পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টের আগে পোপ ত্রয়োদশ লিও প্রবীণতম পোপ ছিলেন, যিনি ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে ৯৩ বছর বয়সে মারা যান। পোপ বেনেডিক্টকে উদ্দেশ্য করে ফামিলিয়া খ্রিস্টিয়ানা (Famiglia Cristiana) লেখে, পৃথিবী ও মণ্ডলীর সেবায় ৩৪,১১১ দিন। পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টের আগে প্রবীণতম পোপ হিসেবে বিবেচিত হওয়া পোপ ত্রয়োদশ লিও সামাজিক সমস্যার ওপর ১ম সর্বজনীন পত্র লিখে বিশেষ পরিচিতি পান। পোপ বেনেডিক্ট স্বল্পকালীন (১৯ এপ্রিল ২০০৫- ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩) পোপীয় সেবাদায়িত্ব পালন করেন। পোপের দায়িত্ব থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি নীরব-ধ্যানীয় জীবন কাটাচ্ছেন ভাতিকানের একটি আশ্রমে। বিগত জুন মাসে তিনি তাঁর ৯৬ বছরের ভাই জর্জকে দেখতে বাভারিয়াতে যান। দু'ভাই ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে একসাথে যাজক হিসেবে অভিষিক্ত হন। বিগত ১ এপ্রিল ভাই জর্জ মারা যান। সম্প্রতি তিনি হুইল চেয়ারে বেরিয়ে এসে দেখা দেন। তাঁর জার্মান জীবনকার পিটার সীওল্ড জানান, পোপ বেনেডিক্টের স্বাস্থ্য বেশ ভেঙ্গে পড়ছে বলে মনে হয়।

ন্যায় ও শান্তি কমিশন এবং কারিতাসের উদ্যোগে “সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল” উদ্বোধন

কমিশন ডেস্ক ▮ ন্যায় ও শান্তি কমিশন-সিবিসিবি ও কারিতাস বাংলাদেশ-এর আয়োজনে গত ৩১ আগস্ট ২০২০ উদ্বোধন হয় “সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল” (The Season of Creation) ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ। ন্যায় ও শান্তি কমিশন এবং কারিতাসের প্রেসিডেন্ট বিশপ জের্ভাস রোজারিও অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কারিতাসের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ফাদার প্রশান্ত টি রিবেরু, সিস্টার পলিন গমেজ সিএসসি, কমিশনের সেক্রেটারি ফাদার লিটন হিউবার্ট গোমেজ সিএসসি, ফাদার আগষ্টিন বুলবুল রিবেরু, কারিতাসের নির্বাহী পরিচালক ফ্রান্সিস অতুল সরকার, পরিচালক (উন্নয়ন) রঞ্জন ফ্রান্সিস রোজারিও, পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) সেবাস্টিয়ান রোজারিও। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কারিতাসের অঞ্চল ও ট্রাস্ট-এর পরিচালকসহ ৮৬জন কর্মকর্তা। অনুষ্ঠানে নির্বাহী পরিচালক সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। তিনি সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল এর সফল উদ্‌যাপনে সকলকে আহ্বান জানান এবং বলেন যে, “আমাদের আবার প্রকৃতির কাছে ফিরে যেতে হবে, প্রকৃতিকে ভালবাসতে হবে ও যত্ন নিতে হবে।” সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কমিশন সেক্রেটারি ফাদার লিটন হিউবার্ট গোমেজ সিএসসি। তিনি বলেন, “কাথলিক মণ্ডলীর সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল অভিযানের উদ্দেশ্য হলো আমাদের ধরিত্রীর পালকীয় যত্নের প্রতি আরো বেশি মনোনিবেশ করা এবং প্রকৃতির সাথে নতুনভাবে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলতে অনুপ্রাণিত হন। তিনি প্রকৃতি ও পরিবেশের মধ্যে সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতি ও তাকে ভালবাসার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। ফাদার আগষ্টিন বুলবুল রিবেরু সৃষ্টি উদ্‌যাপন (Season of Creation) এর তাৎপর্য ও গুরুত্ব আলোচনা করেন। তিনি বলেন- “প্রকৃতি-পরিবেশ এবং মানুষ সৃষ্টির অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রকৃতি ও পরিবেশ ছাড়া মানুষ কখনও সৃষ্টিকে চিন্তা করতে পারবে না। আজ সারা বিশ্বের মানুষ উপলব্ধি করতে পারছে যে আমরা কত অসহায়। তাই প্রকৃতিকে ভালবাসা ও সুরক্ষায় আমাদের আরও বেশি কাজ করতে হবে।”

প্রধান অতিথি, নির্বাহী পরিচালক, পরিচালক (কর্মসূচী) ও সিস্টার পলিন গমেজ সিএসসি তিনটি ফলের চারা (সফেদা, কদবেল ও জলপাই) রোপণ করে কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন। উল্লেখ্য, এ অভিযান চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও ধর্মপল্লী পর্যায়ে প্রার্থনা ও সহভাগিতা চলমান থাকবে।

প্রধান অতিথি বিশপ জের্ভাস রোজারিও উপস্থিত সকলের সাথে Season of Creation-এর গুরুত্ব সহভাগিতা করেন। তিনি বলেন- “আমরা পুণ্যপিতা পোপের আহ্বানে প্রকৃতি ও পরিবেশ সুরক্ষা এবং একই সাথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে কর্মসূচী পালন করছি। কাথলিক চার্চসমূহের আওতায় সারা দেশে প্রায় ৪ লাখ জনগোষ্ঠী আছেন এবং কারিতাসের পরিকল্পনা অনুযায়ী ৩ লাখ চারা রোপণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে অর্থাৎ আগামী বছরের মধ্যে মোট ৭ লাখ চারা রোপণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।” তিনি সকলকে এ কর্মসূচীটি সফল করার জন্য আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন-“আমরা নিজে কেউ বর্জ্য অপসরণ করি না, যার ফলে আমাদের দেশে বর্জ্য বা আবর্জনা পরিবেশকে বেশি দূষিত করছে। আমাদের নদী, শহরাঞ্চলের আবর্জনাকে পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার মধ্যদিয়ে পুনউৎপাদনশীল করতে পারি সে বিষয়ে কাজ করতে হবে। তাছাড়া বেশি করে গাছ লাগাতে হবে, সবুজ প্রকৃতি গড়ে তুলতে হবে।” পরিশেষে কারিতাসের সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুষ্ঠান ও কর্মসূচী সফল করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

মঠবাড়ী ধর্মপল্লীর প্রতিপালক সাধু আগষ্টিনের পর্ব পালন

বকুল রোজারিও ▮ গত ২৮ আগস্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দে মঠবাড়ী ধর্মপল্লীর প্রতিপালক মহান সাধু আগষ্টিনের পর্ব উদ্‌যাপন করা হয়। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও পর্বীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন এবং সহায়তা করেন মঠবাড়ী ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার উজ্জ্বল লিনুস রোজারিও সিএসসি, পবিত্র ক্রুশ যাজক সংঘের প্রভিনসিয়াল ফাদার জেমস্ ক্রুশ সিএসসি, মঠবাড়ী ধর্মপল্লীর সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার কাউন্ট রুজবেল্ট রোজারিও সিএসসি। এছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ফাদার, ব্রাদার, ডিকন, সিস্টার এবং ধর্মপল্লীর বিপুল সংখ্যক খ্রিস্টভক্ত এবং অতিথি ভক্তজনগণ।

পর্ব উপলক্ষে আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি হিসেবে নয় দিনব্যাপি নভেনা খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। খ্রিস্টযাগে কার্ডিনাল উপদেশবাণীতে সবাইকে পর্বীয় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, আজকে আনন্দ প্রকাশের দিন। প্রভু যিশুকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিন। বিগত কয়েকটি মাস আমরা যে অবস্থায় ছিলাম, তা থেকে ঈশ্বর আমাদেরকে রক্ষা করেছেন। আমাদেরকে সুস্থ রেখেছেন। তিনি আজকের এই পর্বদিনে কৃতজ্ঞচিত্তে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানান।

খ্রিস্টযাগের পর কার্ডিনাল মহোদয় মঠবাড়ী ধর্মপল্লীর প্যারিস কাউন্সিলের আয়োজনে ও পুণ্যপিতা পোপের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পরিবেশ ও প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা এবং মুজিববর্ষ উপলক্ষে একটি নারিকেল গাছের চারা রোপণ করেন। পরিশেষে ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার উজ্জ্বল লিনুস রোজারিও সিএসসি সকলকে সার্বিক সহযোগিতা এবং পর্বে অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর চড়াখোলায় নতুন গির্জার ভিত্তিফলক স্থাপন

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ ▌ গত ২৮ আগস্ট, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার স্বাস্থ্যবিধি মেনে কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি কর্তৃক তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর অর্ন্তগত চড়াখোলা গ্রামে স্বর্গোন্নীতা মারীয়ার গির্জার ভিত্তিফলক স্থাপন করা হয়। এছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফাদার জেমস্ ক্রুশ সিএসসি (প্রভিন্সিয়াল), ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া (চ্যান্সেলর), ফাদার তুষার গমেজ, তুমিলিয়ার ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার আলবিন গমেজ, সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ, দুইজন ডিকন ও স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং মেম্বার। নতুন গির্জার ভিত্তিফলক স্থাপনের শুরুতে কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি বলেন, আজ চড়াখোলা এলাকাবাসীর সাথে আমিও আনন্দিত। পরম করুণাময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। সাথে-সাথে আপনাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই যারা চড়াখোলা গির্জার নির্মাণের জন্য জমি এবং আর্থিক অনুদান দিয়ে সাহায্য করেছেন। বহুদিনের প্রত্যাশার যাত্রা শুরু হল। তাই সকলের সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন। এই কাজে সকলে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসবে সেই প্রত্যাশা রাখি।' নতুন গির্জার ভিত্তিফলক স্থাপনের পর কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসিসহ অন্যান্য অতিথিরা একটি জলপাই, একটি লটকন এবং দুটি সেগুনের চারা রোপণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানের শেষে তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার আলবিন গমেজ কার্ডিনাল মহোদয়সহ অন্যান্য অতিথি এবং এলাকাবাসীকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান এবং একই সাথে সকলের সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করেন॥

তুমিলিয়া ও দড়িপাড়া ধর্মপল্লীতে শিশু মঙ্গল সেমিনার- ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ ▌ গত ৩০ আগস্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দে "তোমরাও প্রেরিত"- এই মূলসুরের ওপর ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল সংঘের উদ্যোগে তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর শিশু ও এনিমেটরদের নিয়ে অর্ধদিবসব্যাপী সেমিনারের আয়োজন করা হয়। পাল-পুরোহিত ফাদার আলবিন ও সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ-এর শুভেচ্ছা বাণীর মধ্যদিয়ে সেমিনার শুরু হয়। খ্রিস্টযাগের উপদেশে ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ বলেন, "শিশুরা হচ্ছে প্রেরিতদূত, সরলতার মধ্যদিয়ে শিশুরা অন্যের কাছে প্রেরিত হয় এবং শিশুরা সহজ-সরল বলে সবকিছু ভুলে গিয়ে সবার সাথে মিশতে পারে। সরলতার কারণে শিশুরা সহজেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারে।" খ্রিস্টযাগের পর ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ মূলসুরের ওপর সহভাগিতা করেন। উক্ত সেমিনারে মোট ১৭০জন শিশু এবং ৪০জন এনিমেটর অংশগ্রহণ করেন। পরিশেষে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় শিশুমঙ্গল কমিটির সেক্রেটারি সিস্টার মেরী তৃষিতা সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

গত ৩১ আগস্ট, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে "তোমরাও প্রেরিত"-এই মূলসুরের ওপর শিশুমঙ্গল সংঘের উদ্যোগে দড়িপাড়া ধর্মপল্লীতে অর্ধদিবসব্যাপী এক শিশুমঙ্গল সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন পাল-পুরোহিত ফাদার অমল ডি'ক্রুশ ও সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার এলিয়াস পালমা সিএসসি। খ্রিস্টযাগের পর ফাদার এলিয়াস মূলসুরের ওপর বক্তব্য রাখেন। এরপর শিশুদের নিয়ে রোজারিমালা প্রার্থনা করা হয় এবং এনিমেটর ও শিশুদের শ্রেণিভিত্তিক বাইবেল কুইজ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার হিসেবে যিশু ও মা-মারীয়ার ছবি এবং রোজারিমালা বিতরণ করা হয়। উক্ত সেমিনারে ১৪০ জন শিশু এবং ২০জন এনিমেটর অংশগ্রহণ করেন॥

জাফলং ধর্মপল্লীতে গৃহ আশীর্বাদ

যোশুয়া খংস্লিয়া ▮ গত ০১ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে জাফলং ধর্মপল্লীর বিভিন্ন খাসিয়া পুঞ্জি ও বাগানে গৃহ আশীর্বাদ করা হয়। সকাল ৯টা থেকে লামা, নকশিয়া, প্রতাপপুর, সংগ্রাম, বল্লা, মোকাম এবং জাফলং চা বাগানে একযোগে বাড়ি আশীর্বাদ করা হয়। বাড়ি আশীর্বাদ করেন জাফলং ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা। বাড়ি আশীর্বাদের পর বিশেষ খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা খ্রিস্টযাগের উপদেশে বলেন- 'আমাদের জীবনে দুটো শক্তি কাজ করে, তা হলো পবিত্র আত্মার শক্তি এবং মন্দ শক্তি। আমরা যেন প্রতিনিয়ত পবিত্রাত্মার শক্তির মধ্যদিয়ে পথ চলি। আমাদের জীবনে, পরিবারে, সমাজে ও দেশে পবিত্র আত্মার শক্তির মধ্য দিয়ে যেন মন্দ শক্তির পরাজয় ঘটে। আজকে আমাদের গৃহকে আশীর্বাদ করা হয়েছে। এই গৃহ পবিত্র হয়েছে এবং এখানে স্বয়ং ঈশ্বর বসবাস করছেন। শুধু গৃহ নয় আমরা যেন আমাদের দেহ-মন্দিরকেও সর্বদা পবিত্র রাখি। পবিত্রাত্মার মধ্যদিয়ে আমরা যেন পথ চলি অন্যদেরও পথ চলতে সহায়তা করি।' উক্ত আশীর্বাদ অনুষ্ঠানে পুঞ্জির অনেক খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য জাফলং ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সন্ধ্যা ৬টায় অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

পরলোকগমন

প্রয়াত মার্টিনা রোজারিও
জন্ম: ২১ জানুয়ারি ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২১ আগস্ট ২০২০ (৯২ বছর ৭ মাস)
স্বামী: প্রয়াত অরুণ যোসেফ রোজারিও (এরন মাষ্টার)
গ্রাম: উলুখোলা, মঠবাড়ী মিশন

অত্যন্ত শোকের সাথে জানাচ্ছি যে, মঠবাড়ী মিশন, উলুখোলা গ্রামের শ্রদ্ধেয়া মার্টিনা রোজারিও বিগত ২১ আগস্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দে, রোজ শুক্রবার দুপুর ২:৩৮ মিনিটে নিজ বাড়িতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত হয়ে দীর্ঘ ১ বৎসর শয্যাশায়ী ছিলেন। ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন স্বনামধন্য স্বর্গীয় এরন মাস্টারের সহধর্মিণী। তার সন্তানদের মধ্যে, বড় ছেলে মার্ক শংকর রোজারিও ২০১২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। প্রয়াত মার্টিনা রোজারিও রেখে গেছেন এক ছেলে, দুই মেয়ে ও দুই মেয়ে-জামাই, এক পুত্র বধূ, সাত নাতী- নাতনী, দুই পুতিন, তিন নাতিন জামাতা, বহু আত্মীয় ও গুণগ্রাহী।

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ২১ জানুয়ারি তারিখে তিনি নাগরী মিশনস্থ শালজোড়া গ্রামে নিজ পিতালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তার কর্মজীবন শুরু হয় মঠবাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার মাধ্যমে। পরবর্তীতে নাগরীর হাসপাতালের একজন নার্সসেবী হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। এছাড়া স্থানীয় পরিবেশে বিভিন্ন সংঘ, সমিতির সদস্য ও সক্রিয় কর্মী ছিলেন। পেশা হিসেবে শিক্ষকতা ও সামাজিকতায় বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন বলে তিনি ছিলেন এলাকার এক পরিচিত মুখ। এমনকি তার অবসর জীবনে অনেক প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী, সহকর্মী ও গুণগ্রাহী সাক্ষাত লাভের জন্য তার কাছে আসতেন।

তার অসুস্থতাকালীন সময়ে বিশেষত যারা দূর-দূরান্ত থেকে এসে তাকে সঙ্গ দিয়ে, সান্ত্বনা দিয়ে ও প্রার্থনার মাধ্যমে মনোবল বৃদ্ধিয়েছেন তাদের সবার প্রতি রইল অসংখ্য ধন্যবাদ। তিনি একজন সৎ, ধার্মিক ও আদর্শ শিক্ষিকা ও আদর্শ মানুষ ছিলেন বিধায় ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করবেন এটাই আমাদের কাম্য। তবুও পাপ-পঙ্কিলতার শতসহস্রতম কলঙ্কিমা যেন তাকে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভে অন্তরায় সৃষ্টি না করে, তার জন্য সবার প্রার্থনা কামনা করছি।

শোকাহত পরিবারবর্গের পক্ষে সন্তানগণ ও আত্মীয়স্বজন

পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!!

প্রতিবেশী প্রকাশনীতে ধর্মীয় দ্রব্যাদির আকর্ষনীয় সম্ভার।

* রেডিয়ামের বিশেষ রকমের মূর্তি
* পানপাত্র
* আকর্ষনীয় নতুন ক্রুশ ও রোজারিমালা
* এছাড়াও সাধু-সাধ্বীদের জীবনী বই

এছাড়াও যা পাওয়া যাচ্ছে –

❒ খ্রিস্টযাগ রীতি ❒ খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
❒ ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
❒ কাথলিক ডিরেক্টরী ❒ এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
❒ যুগে যুগে গল্প ❒ সমাজ ভাবনা

আপনাদের পরিবার খ্রিস্টীয় আদর্শে গড়ার লক্ষ্যে ধর্মীয় দ্রবাদি ব্যবহার করুন ও ধর্মীয় বই পড়ুন।

শিঘ্রই পাওয়া যাবে

অতি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও প্রতিবেশী প্রকাশনী দৈনিক বাইবেল পাঠ (**বাইবেল ডায়েরী ২০২১** - **BIBLE DIARY** - Daily Prayer Book) ভারত থেকে আমদানী করছে। তাই আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আজই অর্ডার দিন।

প্রতিবেশী প্রকাশনী প্রতি বছরের ন্যায় এবারও আগামী **২০২১ খ্রিস্টাব্দের বাইবেল ভিত্তিক খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডার ছাপার প্রস্তুতি নিচ্ছে।** আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনটি প্রতিবেশী প্রকাশনীর ক্যালেন্ডারে প্রকাশের জন্য আজই যোগাযোগ করুন।

-যোগাযোগের ঠিকানা -

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

বর্ষ ৮০ ❖ সংখ্যা- ৩৩
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 33
Regd. No. DA-33
❖ 13 - 19 September, 2020, ২৯ ভাদ্র - ৪ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব **'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।** গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেওয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশীর বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যার জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যার বিজ্ঞাপন হার :-

শেষ কভার (চার রঙ)	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো	৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো	২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো	১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো	১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো	৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার

আর দেরি নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য

বিজ্ঞাপন বিভাগ
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com, Webpage link : www.weekly.pratibeshi.org**